সুবোধ ঘোষ

পরিবেশক :

ডি, হাজরা এণ্ড কোং
১৩, সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা ঃঃ ১২

দিগঙ্গনা

সুবোধ ঘোষ

প্রকাশক :
শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্তী
বেহালা, কলিকাতা-৩৪

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৬৭

ব্লক নির্মাতা :
রয়্যাল হাফটোন কোং

মফঃস্বল পরিবেশক :
গণনির্দেশ পুস্তকালয়
মুর্শিদাবাদ

প্রচ্ছদ :
শচীন বিশ্বাস

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
শ্রীকালী আর্ট প্রেস
৪নং সরকার বাই লেন

মুদ্রক :
শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২সি, শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

দাম : তিন টাকা মাত্র

মনে মনে তৈরী হয়েই চলে এসেছিল বীথিকা। যত দিন না পরের বাড়ি যাবার ডাক আসে, ততদিন এখানেই মনের সুখে থাকা যাবে।

অভিজিৎ-এর বাবা আর মা দুজনের কেউ ভাবতে পারেননি যে, পাটনার নতুন কলেজের অধ্যাপনার কাজটা হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে অভিজিৎ। ভালই হয়েছে, চাকরি না করলেও অভিজিৎ-এর দিন ভালই চলে যাবে। বাপ-মায়ের এক ছেলে অভিজিৎ। তিনটে গালা কুঠীর মালিক যিনি, আর বহু চা-বাগানের বিস্তর শেয়ারের অধিকারী যিনি, সেই রাখালবাবুর একমাত্র ছেলে অভিজিৎ একটা মাস্টারী চাকরী নিয়ে পাটনাতে পড়ে থাকবে কেন, কথাটা একদিন অনুকূলবাবু বলেছিলেন।

পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট-কদমডিহি, রাঁচি এখানে থেকে ঊনত্রিশ মাইল। রাখালবাবুর বাড়িটা কিন্তু আকারে-প্রকারে যে-কোন শহুরে ম্যানসনকেও হার মানায়। রাখালবাবুর বাড়ির বাগানেও রাত্রিবেলা বিজলী বাতি জ্বলে। বাগানে পোষা ময়ূর আর হরিণ চরে বেড়ায়। প্রতি সপ্তাহে রেল-পার্শেল হয়ে অভিজিৎ-এর বই আসে। সেই সব বইয়ের বোঝা বয়ে আনবার জন্য একটা চাকর প্রতি সপ্তাহে তিন মাইল দূরের রেল স্টেশনে যায়। অভিজিৎ-এর জীবনের সব চেয়ে বড় আগ্রহের সম্পদ যত ফিলসফির বই। যত স্পিনোজা কাণ্ট আর ডেকার্ট। যত জেমস্ ডিউই আর রাধাকৃষ্ণণ। জৈমিনী পতঞ্জল আর গৌতমের যত ভাষ্যের ভিড় তো আছেই, শেলফে আর ঠাঁই নেই। অভিজিৎ-এর বিছানার উপরেও দেখতে পাওয়া যায়; হয়তো ছড়িয়ে পড়ে আছে ম্যাথেমেটিকাল ফিলসফির তিনটে ভল্যুম; কিংবা ত্রিপিটকের কলম্বো এডিশন।

বীথিকার কাকা অনুকূলবাবুর বাড়িটাও সৌখীনতায় কম যায় না। বাড়ির চেহারাতে ইঁটের চেয়ে কাঠের কাজই বেশি বলে মনে হয়। অনুকূল বাবু এই অঞ্চলের সব চেয়ে পুরনো ফরেস্ট কণ্ট্রাক্টর। তাঁর

টিমবার ইয়ার্ড লম্বায় প্রায় এক মাইল। করাত কলটাও দশ বছর ধরে চলছে। সম্প্রতি কাঠ সীজন করবার যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন।

অনুকূলবাবুর বাড়ির বাগানটা কিন্তু তেমন সৌখীন নয়। বাগানটাকে সূর্যমুখীর একটা জঙ্গল বলে মনে হয়। বীথিকাও বলেছিল—আপনি শুধু গাছ কাটতে জানেন কাকা। গাছকে বাঁচাতে জানেন না।

—তার মানে? একটু আশ্চর্য হয়ে আর হেসে হেসে প্রশ্ন করেছিলেন অনুকূলবাবু।

বীথিকা বলেছিল—রাখালবাবুর বাড়ির অশোকের মত দু'চারটে অশোক আপনিও ইচ্ছে করলে এই বাগানে রাখতে পারতেন।

—অশোক ফুল তোর ভাল লাগে? কি-রকম যেন স্নেহাভিভূত মৃদুস্বরে আর উৎসুক চোখে প্রশ্ন করেছিলেন অনুকূলবাবু।

বীথিকাও বেশ উৎফুল্ল স্বরে উত্তর দিয়েছিল—নিশ্চয়, খুব ভাল লাগে।

অনুকূলবাবু বলেছিলেন—আচ্ছা।

সেদিনের পর আর একটি দিনও দেরি করেননি অনুকূলবাবু। রাখালবাবুর বাড়িতে গিয়ে একেবারে খোলামেলা ভাষায় প্রস্তাব করেছিলেন—ইচ্ছে করেন তো আপনার ছেলের জন্যে একটি ভাল মেয়ে পেতে পারেন রাখালদা।

কথাটা শুনে অভিজিৎ-এর মা প্রায় ছুটে এসেছিলেন। —কে? কার কথা বলছেন? বীথিকা?

অনুকূলবাবু—হ্যাঁ।

রাখালবাবু—কী অদ্ভুত যোগাযোগ! আমি আর উনি এই কদিন ধরে ঠিক এই কথাই বলাবলি করছিলাম অনুকূল।

ঠিক কথা, অভিজিৎ-এর বইপড়া জীবনের রকম-সকম দেখে বেশ চিন্তায় পড়েছিলেন রাখালবাবু। অভিজিৎ-এর মা তো ভয় পেয়ে নানা রকম মানত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অনুকূলবাবুর

কথাগুলিকে তাই ভয়ভাঙ্গা আশীর্বাদের ভাষা বলে মনে হয়েছিল।

তারপর আর দেরি হয়নি। বীথিকার নাম শুনে অভিজিৎ-এর চোখ দুটো যেন বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছে; সেদিন সে দৃশ্য দেখে বীথিকাকেও একটা আশীর্বাদ বলে মনে করেছিলেন অভিজিৎ-এর মা।

কে জানে কেন, রাখালবাবুর শুধু একটা দাবি ছিল।—কলকাতাতে নয়; এখান থেকে মাত্র উনত্রিশ মাইল দূরে রাঁচিতেই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে যাক্।

আপত্তি করেননি অনুকূলবাবু। বীথিকার বাবা আর মা'ও আপত্তি করেননি। অভিজিৎ-এর মত ছেলের হাতে মেয়েকে সঁপে দেবার সুযোগ পেয়েছেন; সুযোগটাকে দৈব অনুগ্রহের একটা দান, একটা সৌভাগ্য বলেই মনে করেছিলেন তাঁরা। দেরি করা উচিত নয়। কলকাতা থেকে বীথিকার বাবা আর মা'ও আশ্চর্য হয়ে কদমডিহিতে এসেছিলেন।

কাকিমার প্রশ্নের উত্তরে বীথিকাও মুখ খুলে বলে দিতে পেরেছিল—আমার আপত্তি করবার কি আছে? ফিলসফির মানুষ যদি রাজি হয়ে থাকেন, তবে আমিও রাজি।

কাকিমাও দেখে খুশি হয়েছিলেন, এত স্বচ্ছন্দে কথা বলতে গিয়েও বীথিকার মুখের উপর যেন এক ঝলক রক্তাভ খুশির লজ্জা উথলে উঠেছে।

বিয়েটা রাঁচিতে হয়েছিল, কিন্তু বাসরের আয়োজন হয়েছিল কদমডিহির এই বাড়িতে, যেখানে বাগানের ঘাসের উপর খুশি ময়ূর পেখম কাঁপিয়ে নাচে আর অশোকের গায়ে গলা ঘষে নধর চিতল হরিণ।

ঘরে কেউ ছিল না, তবু অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি অভিজিৎ।

বীথিকা তাই একটু আশ্চর্য হয়ে আর হেঁটমাথা তুলে অভিজিৎ-

এর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তখনই কথা বলেছিল অভিজিৎ। আর সেই কথা শুনে বীথিকার চোখের তারা দুটো থরথর কেঁপে উঠেছিল।

—অনন্ততা বলতে তুমি কি বোঝ? তোমার কি ধারণা? দু'চোখে কী অদ্ভুত এক মুগ্ধতা উথলে দিয়ে প্রশ্ন করছে অভিজিৎ। বীথিকার মনে হয়েছিল, অভিজিৎ যেন এই ঘরের মধ্যে অদৃশ্য এক মায়াসুন্দর ছায়ার সঙ্গে কথা বলছে।

বীথিকা—কি বললে?

অভিজিৎ—আরম্ভ নেই, শেষও নেই, এরকম একটা অস্তিত্ব কি করে সম্ভব?

বীথিকা—আমাকে জিজ্ঞেসা করছো?

অভিজিৎ—নিশ্চয়। তুমি যে আমার স্ত্রী।

বীথিকা—স্ত্রীকে একথা জিজ্ঞেসা করবার কোন মানে হয় না।

বীথিকার গলার স্বরে মৃদুতা থাকলেও কথাগুলির মধ্যে যেন একটা ভয়ানক সন্দেহের জ্বালা ছটফট করে উঠেছিল। আর সেই মুহূর্তে অভিজিৎ-এর দু'চোখের প্রশ্নাকুল মুগ্ধতাও যেন করুণ হয়ে গিয়েছিল।

সে-রাতের পর আর বোধহয় সাতটা দিন ও রাত পার হয়নি, কদমডিহির দুই বাড়ির মনও দুঃসহ এক আক্ষেপে করুণ হয়ে গিয়েছিল। না, বিয়েটা এত তাড়াহুড়ো করে না হলেই ভাল হতো। আর কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

অভিজিৎ-এর বাবা আর মা এত ভয় পেয়েছিলেন যে লজ্জিত হতেও ভুলে গিয়েছিলেন। অনুকূলবাবুর হাত ধরে ক্ষমা চেয়েছিলেন রাখালবাবু—আমাকে মাপ কর অনুকূল। বড় অন্যায় করে ফেলেছি। খুবই ভুল হয়েছে। একটু দেরি করা উচিত ছিল।

অনুকূলবাবুর গলার স্বরও বেদনা চাপতে গিয়ে করুণ হয়ে গিয়েছিল—ভুল আমাদের ও হয়েছে। অভিজিৎ-এর ফিলসফিকে আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল।

এখন কিন্তু আর সন্দেহ করবারও কোন প্রশ্ন নেই। অভিজিৎ নিজেই নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। সারাদিন ও রাতের মধ্যে একটা কথাও বলে না অভিজিৎ। , বই পড়ে, বিড় বিড় করে, আর, যেন প্রশ্নহীন অর্থহীন এক জোড়া স্তব্ধ চোখের উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে কে জানে কোন্ দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর বীথিকা সারাটা দিন এতবড় বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরটার মধ্যে একেবারে একলা হয়ে একটা বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে থাকে। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠতেও হয়। অভিজিৎ-এর মা ছুটে এসে বীথিকার হাত ধরেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন—তুমি আর একটিবার আমার কথাটা শোন, লক্ষ্মী মেয়েটি। অভিজিৎ-এর কাছে গিয়ে একটু বসো। চা হয়েছে, তুমি নিজের হাতে ওকে চা দিয়ে এস।

—কি দরকার? কথা বলতে গিয়ে বীথিকার বেদনার্ত গলার স্বরও যেন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

অভিজিৎ-এর মা বলেন—আমার বিশ্বাস, তুমি কাছে গেলেই কথা বলবে অভিজিৎ।

এই অনুরোধ অবশ্য তুচ্ছ করেনি বীথিকা। একবার দুবার নয়, অনেকবার এই অনুরোধের সঙ্গে যেন একটা চরম বোঝাপড়া করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অভিজিৎ-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বীথিকা, হাতে চায়ের কাপ। কিন্তু অভিজিৎ মুখ তুলে বীথিকার মুখের দিকে তাকিয়েও যেন কিছুই দেখতে পায়নি। বীথিকা যেন কোন অস্তিত্বই নয়। শুধু বাগানের অশোকের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেছে, আর স্পিনোজার একটা বিরাট ভল্যুমের পাতা উলটিয়ে কি-যেন খুঁজেছে আর পড়েছে অভিজিৎ। চুপ-চাপ ফিরে গিয়েছে বীথিকা।

দুটো মাস এভাবেই পার হয়ে যাবার পর একদিন কাকিমা এসে বীথিকাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কাকিমাও বড় করুণ স্বরে অনুরোধ করলেন—আমার একটা কথা শোন বীথি?

—বলুন।

—অভিজিৎকে তুমি একটা চিঠি দাও।

—দরকার কি ?

—আমার মনে হয়, তোমার চিঠি নিশ্চয় পড়বে অভিজিৎ, উত্তরও দেবে।

চিঠি দিয়েছিল বীথিকা। একটা দুটো নয়, বোধহয় কুড়ি-পঁচিশটা। কিন্তু কোন চিঠির উত্তর আসেনি। আর, তিনমাস পরে কাকিমারই সঙ্গে অভিজিৎ-এর বাড়িতে এসে দেখতে পেয়েছিল বীথিকা, খামে বন্ধ সেই সব চিঠি অভিজিৎ-এর পড়ার ঘরের বইয়ের যতো এলোমেলো স্তুপের এদিকে ওদিকে আর ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে ও গড়িয়ে পড়ে আছে। একটা চিঠিও খোলেনি বা পড়েনি অভিজিৎ। বীথিকা বলেছিল—আর কেন কাকিমা ? সবই তো দেখা গেল।

কাকিমা বললেন—হ্যাঁ।

অভিজিৎ-এর মা বললেন—না, আমার আর কিছু বলবার নেই।

সত্যিই তো, আর কি-ই বা বলবেন অভিজিৎ-এর মা ? অভিজিৎ পাগল হয়েছে, এই সত্যে আর সন্দেহ কোথায় ?

[দুই]

বি-এ পরীক্ষার ফল বের হয়েছিল যেদিন, তারও পরে আরও দুটো বছর পার হয়েছে। বীথিকা বেশ বুঝে নিয়েছে, বি-এ পরীক্ষা পাশ করলেও ভাগ্যের পরীক্ষায় জীবনটা ফেল করেছে। কাজেই কলকাতায় ফিরে গিয়ে মুখ দেখাবার কোন দরকার নেই। পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘেরা এই নিরালা কদমডিহির কাকার বাড়িই ভাল। ভালই, কাকার বাড়ির বাগানে কোন বড় গাছের শোভা নেই। সূর্যমুখীর জঙ্গলে হিংসুটে বহুরূপী লিকলিকে জিভের চাবুক চালিয়ে রঙীন প্রজাপতি শিকার করে, তাও ভাল। অন্তত বীথিকার ভাগ্যটার চেয়ে ভাল ভাগ্য পেয়েছিল রঙীন প্রজাপতি। একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টার

সঙ্গে বিয়ে হওয়া এই জীবনটাকে এখানেই চুপ-চাপ কাটিয়ে দিতে পারলে আরও ভাল।

আরও একটা ভাল ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, যে জন্যে বীথিকার কদমডিহির এই জীবন একটা স্বস্তি লাভ করেছে। অভিজিৎ এখানে নেই। রাখালবাবুর গালাকুঠির ম্যানেজার হৃদয়বাবু আর দুটো চাকরের খবরদারির অধীন হয়ে পাগল অভিজিৎ এখন আছে দেরাদুনে। তার আগে ছিল সিমলাতে। রাঁচির মানসিক হাসপাতালের লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল হিল যা বলে দিয়েছেন তাই করা হয়েছে। খাওয়া দাওয়া, কাজ, ঘুম, বিরাম, খেলা, আর বেড়াবার যে সব নিয়ম করে দিয়েছেন, ঠিক সেই সব নিয়মের শাসনে ও আদরে অভিজিৎ-এর জীবনের দিনগুলি পার হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু···সে খবর পেয়েছে বীথিকা, যা ছিল অভিজিৎ আজও তাই আছে। একটু বদলায়নি। সেই শুব্ধ দৃষ্টি, সেই গম্ভীর মুখ, সেই মৃদু বিড়বিড়, আর সেই নির্বাক্ অস্তিত্ব। মাসে হাজার টাকার বেশি টাকা খরচ করছেন রাখালবাবু, কিন্তু অভিজিৎ-এর মুখে একটি কথাও ফোটাতে পারেননি।

কাকা আর কাকিমার মন কিন্তু তাদের পুরনো বিষাদের মধ্যে আবার একটা দুশ্চিন্তার আঘাত পেয়ে চমকে উঠেছে। বীথিকা এখন আর সে-রকম গম্ভীর হয়ে আর ঘরের নিভৃতে একলাটি হয়ে পড়ে থাকতে চায় না। বীথিকার চোখের তারা যেন মাঝে মাঝে ঝড়ের রাতের তারার মত অদ্ভুতভাবে ঝিকমিকিয়ে হেসে ওঠে। অনুকূলবাবুও মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে বীথিকার কাকিমাকে আড়ালে পেয়ে প্রশ্ন করেন—সৌম্যেন কি আজও এসেছিল?

কাকিমা বলেন—হ্যাঁ।

কদমডিহি থেকে পঁচিশ মাইল দূরে সিলিঘাটের নতুন কলিয়ারি ম্যানেজার হয়ে এখন কাজ করছে যে, সেই সৌম্যেন হলো কাকিমারই বড়দির মেজ ছেলে সৌম্যেন। সৌম্যেন দেখতে বেশ সুন্দর।

সৌম্যেন এক হাতে গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধরে আর-এক হাতে বন্দুক ফায়ার করতে পারে। সেই বন্দুকের এক গুলীতে জংলীপথের সন্ধ্যাবেলার ভালুক হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে আর মরে যায়। সৌম্যেনের কাছেই এই গল্প শুনে কাকিমার কাছে গল্প করেছে বীথিকা।

ষোল আনা কাজের মানুষ সৌম্যেন। সৌম্যেন নিজেই বলেছে, বই-টই পড়ার কোন শখ-বালাই আমার নেই। ওসব আমার ধাতেই সহ্য হয় না। তার চেয়ে ঢের ভাল আমার এই হল্যাণ্ড এণ্ড হল্যাণ্ড। কাজের ফাঁকে কিংবা ছুটিছাটার দিনে অন্তত দুচারটা হরিয়াল মেরে সময়টা সার্থক করি। আমি এক মিনিট চুপ করে বসে থাকতে পারি না, মাসিমা।

বোধহয় আস্তে কথা বলতে পারে না সৌমোন, চেঁচিয়ে কথা বলাই অভ্যাস। একদিন অনুকূলবাবুর চোখের সামনে মাত্র দুহাত দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও চিৎকার করে হেসে হেসে একটা সুখবর জানিয়েছে সৌম্যেন—আমার জন্যে একটা নতুন বাংলো তৈরির খরচ মঞ্জুর করিয়ে ছেড়েছি, মেসোমশাই। তিনমাস ধরে অবিরাম তাগিদ দিয়ে দিয়ে হেড অফিসকে অস্থির করে তুলেছিলাম।

বীথিকার সঙ্গে যে-সব কথা বলে সৌম্যেন, সে-সব কথা ওদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়েও শুনতে পান কাকিমা।

—তুমি সারাদিন কি কর বীথিকা?

—কি আর করবো? চুপ করে বসে থাকি।

—কাজ করনা কেন?

—ভাল লাগে না।

—কেন?

—কোনো কাজে মন লাগে না।

—আমি বলতে পারি, একটা কাজ তোমার খুব ভাল লাগবে।

—কি?

—তুমি গাড়ি ড্রাইভিং শিখে ফেল।

—কে শেখাবে? আপনি?

—হ্যাঁ।

—আপনার সময় কোথায়?

—তুমি বললে সময় পাব না কেন?

বীথিকা কি উত্তর দিল, সেটা আর শুনতে পাননি কাকিমা। মনে হয়েছিল কাকিমার, বীথিকা বোধ হয় হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে সৌম্যেনের কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন দিকে চলে গেল।

এর পর আর কোনদিন বীথিকাকে সন্দেহ করবার কোন দরকার হলো না। বীথিকা নিজেই নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। কবে কোন্ সময়ে সৌম্যেন আসবে, ঘটনার নিয়মটাকে যেন মনে-প্রাণে আর স্বপ্নেও সব সময় স্মরণ করছে বীথিকা। একটুও ভুল হয় না। মঙ্গলবারের বিকেলবেলা আর রবিবারে সকালবেলা গেটের কাছে এসে বীথিকা যেন ব্যাকুল এক আশার অভিসারিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে।

দেখে মনে হয়, বীথিকার প্রাণটাও যেন আশ্বস্ত হয়েছে। না, ভয় করবার কিছু নেই। সৌম্যেন ভুলেও কোন বই ছোঁয় না। সৌম্যেন একটুও গম্ভীর নয়। সৌম্যেন অবিরাম কথা বলে। ভালই তো। এক মিনিটও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না সৌম্যেন; কাজ কথা খেলা আর খুশির এই চমৎকার অশান্ত মানুষটি ইচ্ছে করলে রোজই এখানে আসতে পারে; আসতে চায়ও বোধহয়। ভাবতে ভাল লাগে বীথিকার। বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও করে বৈকি।

কাকিমা সেদিন একেবারে স্পষ্ট করে শুনতে পেলেন, গেটের কাছে যেন দুর্বার একটা অভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে সৌম্যেনের সঙ্গে কথা বলছে।—তুমি তো ইচ্ছে করলে রোজই একবার আসতে পার, তবু আস না কেন?

সৌম্যেন বলে—তার চেয়ে ভাল হয় না কি, যদি···।

বীথিকা—কি ?

সৌম্যেন—তুমি আমার ওখানে চলে যাও।

বীথিকা—তার মানে ?

সৌম্যেন হাসে—তার মানে, মাসিমাকে এবার স্পষ্ট করে বলেই দাও।

কাকিমা ব্যস্তভাবে ঘরের জানালার কাছে এসে গেটের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, বেশ স্পষ্ট দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে, মাথা হেঁট করে আর একবারে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বীথিকা। কাকিমার চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন অদ্ভুত এক মমতার আবেশে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। মেয়েটা যেন একটা সৌভাগ্যের দাবির কাছে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে আছে; আপত্তি করতে পারছে না বীথিকা। আপত্তি করবার কোন ইচ্ছেও নেই।

একটু আশ্চর্যও হয়েছিলেন কাকিমা। সৌম্যেনের কাছে কিছুই তো অজানা নয়। বীথিকার দুর্ভাগ্যময় বিয়েটার সব ইতিহাস সৌম্যেন শুনেছে। অনুকূলবাবু তো এই সেদিনও অভিজিৎ-এর মনের রোগের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে দুঃখ করে নানা কথা সৌম্যেনের কাছে বলেছিলেন। মস্তিষ্কের প্যারালিসিস নয়। স্মৃতিবিলোপ কি না তাও স্পেশ্যালিস্টেরা জোর করে বলতে পারছেন না। লস অব নার্ভ বলেও মনে হচ্ছে না। খুবই জটিল রকমের ইনস্যানিটি। কোন দিন সারবে বলে মনে হয় না।

সৌম্যেন শুধু বলেছিল—এটাও একধরনের মৃত্যু। প্রাণ নিয়েও মরে থাকা।

অনুকূলবাবুও সায় দিয়ে বলেছিলেন—তাই।

তবে আর আপত্তি করবার কি আছে ? যেমন সৌম্যেনের ধারণার কাছে তেমনই বীথিকার জীবনের কাছে পাগল অভিজিৎ আজ আর কোন সজীব অস্তিত্বই নয়। তবে বীথিকার সঙ্গে সৌম্যেনের বিয়ে হতে বাধাই বা কোথায় ?

কাকা আর কাকিমার আপত্তি দূরে থাকুক, তাঁরা বরং একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতাতে বীথিকার বাবা আর মাকেও চিঠি লিখে সব কথা জানালেন। বাবা আর মারও কোন আপত্তি নেই; কারণ সৌম্যেনকে তাঁরাও ভাল করে চেনেন।

অনুকূলবাবু একদিন রাখালবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে খুশির স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—না, রাখালদারও কোন আপত্তি নেই। অভিজিৎ-এর মারও আপত্তি নেই।

রাখালবাবু বলেছেন, আর অভিজিৎ-এর মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে হেসেছেন—আমরাও মনে প্রাণে এই আশীর্বাদ করেছিলাম, বীথিকার যেন আবার বিয়ে হয়। ভগবান করুন, বীথিকা যেন সুখী হয়।

অনুকূলবাবু—কিন্তু···।

রাখালবাবু—কিসের কিন্তু?

অনুকূলবাবু—সবার আগে আদালতে দরখাস্ত করে বীথিকার জন্যে ডাইভোর্স মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয়।

রাখালবাবু ফুঁপিয়ে ওঠেন।—নাও। শিগগির নিয়ে ফেল। আমি বার্কলে-হিল সাহেবের সার্টিফিকেট আনিয়ে দিচ্ছি, পাগল অভিজিৎ-এর সুস্থ হবার কোন আশা নেই।

বীথিকার জীবন আর মাত্র ছ'টা মাস অপেক্ষার দুঃখ সহ্য করেছিল। তারপর আর নয়। সূর্যমুখীর জঙ্গলে নতুন প্রজাপতির ভিড় দেখা দিতেই পাটনা থেকে খবর পেয়ে গেলেন অনুকূলবাবু, ডাইভোর্স মঞ্জুর হয়েছে; আর, সৌম্যেন তার নতুন বাংলোতে উঠে গিয়ে ঘর সাজিয়েছে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বীথিকাকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন পাটনাতে রওনা হলেন কাকা আর কাকিমা, সেদিন রাখালবাবু আর অভিজিৎ-এর মা বীথিকার জন্যে দুটি আশীর্বাদী ঢাকাই সাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

[তিন]

সিলিঘাট কলিয়ারির ম্যানেজারের বাংলো, অর্থাৎ সৌম্যেনের ভালবাসার আনন্দ দিয়ে সাজানো ঘর, অর্থাৎ নিশ্চিন্ত শান্ত ও সুখী বীথিকার স্বামীর ঘর। বিয়ের পর তিন বছরে মধ্যে তিনবার কলকাতায় মার কাছে, আর বোধ হয় ত্রিশবার কদমডিহিতে কাকিমার কাছে এসেছে বীথিকা। কিন্তু প্রত্যেকবার সৌম্যেনও সঙ্গে এসেছে। তিন বছরের মধ্যে একটি দিনও সৌম্যেনকে না-দেখে-থাকবার দুঃখ সহ্য করতে হয়নি বীথিকার। বীথিকার ভাগ্যের ফলক থেকে পুরনো ক্ষতের দাগ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে।

তিন বছরের মধ্যে ত্রিশবার কদমডিহিতে এসে কাকিমার কাছে থেকে গেলেও কোনদিন চোখে পড়েনি বীথিকার, রাখালবাবুর বাড়ির সৌখীন লনের পাশে অশোকের মাথা নতুন ফুলের গৌরব রঙীন হয়েছে কিনা। সকালে আর বিকেলে অবশ্য সৌম্যেনের সঙ্গে রোজই বেড়াতে বের হতে হয়েছে। চঞ্চল সৌম্যেনের সঙ্গে প্রায় ছুটে ছুটে হাঁটতে হয়েছে। শালবনের ধারে এসে সূর্যাস্ত দেখতে হয়েছে। ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়তে আর ক্লান্ত হতেও ভাল লেগেছে বীথিকার।

সৌম্যেনের ব্যস্ততাও বড় মুখর। কাকিমার সামনেই জোরে চিৎকার করে ডাক দেয় সৌমেন—বীথি বীথি।

অর্থাৎ চা চাই। দুঘণ্টা পর পর চা খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে সৌম্যেন। আর, বেশ বুঝতে পারা যায়, সোমেন চায়, ঠাকুর রামজীবন নয়, বীথিকাই চা নিয়ে আসুক।

লজ্জা পেলেও নিজের মনের কাছে অস্বীকার করতে পারে না বীথিকা, বীথিকার হাতের ছোঁয়া চা খাওয়ার জন্য সৌম্যেনের এই পিপাসার হাঁকডাক শুনতে ভালই লাগে বীথিকার। আরও লজ্জার কথা, সেদিন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সৌমে;নের সঙ্গে গল্প করার সময় সৌম্যেনের শক্ত মুঠোর বাঁধন থেকে হাতটাকে ছাড়িয়ে নিতে পারেনি

বীথিকা, যদিও কাকা সামনে এসে পড়েছিলেন। এই লজ্জাটাকে সহ্য করতেও ভাল লেগেছিল। অদ্ভুত এক তৃপ্তির মধুরতায় ভরে উঠেছিল বীথিকার মন।

কিন্তু এবার, চৈত্র মাসের রোদের ঝাঁজে সূর্যমুখীর জঙ্গলটা যে-সময় বেশ শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে, সে-সময় কলকাতা থেকে বীথিকার মা'র একটা চিঠি পেয়ে বেশ সাবধান হয়ে গেলেন কাকিমা। না, এবার কিছুদিন বীথিকা একাই এখানে থেকে যাক। সৌম্যেনের সাতদিনের ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর এবার একাই সিলিঘাটে ফিরে যাক্ সৌম্যেন। বীথিকার মা লিখেছেন, বীথির ছেলেপুলে হবে বোধ হয়, খবর পেলাম বীথির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

কাকিমার দাবির কথাটা শুনতে একটুও ভাল লাগেনি বীথিকার। কাকিমা যে সত্যিই একটা শাসনের নিয়ম টেনে নিয়ে এসে সৌম্যেনকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন। দুঃসহ। জীবনে এই প্রথম দুজনকে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে হবে, ভাবতে গিয়ে বীথিকার প্রাণটাই যেন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

শেষে কাকার অনুরোধের চাপে পড়ে রাজি হয় বীথিকা। কাকা বললেন—সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন তো আসতে পারবে সৌম্যেন, তবে আর এত আপত্তি করবার কি আছে?

সাতদিনের ছুটির মাত্র একটা দিন পার হতেই বীথিকার কাছে এসে হেসে ফেলে সৌম্যেন।—ভাল ব্যবস্থা হয়েছে।

—কি?

—কাকা বললেন, আর ছ'দিন পরেই আমাকে তাড়িয়ে দেবেন।

বীথিকাও হাসে—ভালই হলো।

সৌম্যেন—যাক্, যা হবার তা হবে। এখন এই ছ'টা দিন অন্তত মনের সুখে একসঙ্গে বেড়িয়ে নেওয়া যাক্, কি বল?

বীথিকা—নিশ্চয়।

অন্য ঘরের ভিতর থেকে কাকিমা হঠাৎ ডাক দিলেন—একটা কথা শুনে যাও বীথি।

কি কথা ?

এমন কিছু, দুশ্চিন্তার কথা নয়। সামান্য একটা চক্ষুলজ্জার কথা। কাকিমা বলেন—এ ক'দিন তোমাদের বাইরে বেড়ানো বন্ধ রাখাই ভাল।

বীথিকা—কেন ?

—রাখালবাবুর বাড়ির কাছ ঘেঁষে যাওয়া-আসা না করাই ভাল।

—কেন কাকিমা ?

—যদিও নিরেট পাগল। তবু তো চক্ষুলজ্জার একটা ব্যাপার আছে।

—তার মানে ?

—অভিজিৎ এখন এখানেই আছে। এক মাস হলো দেরাদুন থেকে ফিরে এসেছে।

—বয়ে গেছে। যেন রূঢ় রুক্ষ ধিক্কারের মত একটা উদ্ধত অপ্রসন্নতার স্বর বীথিকার সুখী মনের আক্রোশ হয়ে বেজে ওঠে। বোধ হয় বলতে চায় বীথিকা, কিসের চক্ষুলজ্জা ? পাগল অভিজিৎ আজ বীথিকার জীবনে একটা মৃত দুঃস্বপ্ন মাত্র।

কাকিমা অপ্রস্তুতের মত বলেন—তবু···তার মানে···।

ঠিকই বলেছেন কাকিমা। বীথিকার মনটা যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। জেদ করবার কোন মানে হয় না। রাখাল বাবুর বাড়ির অশোকের মাথা রঙীন ফুলে ভরে গেল কিনা, এটা আজ আর বীথিকার জীবনে দেখবার মত বা খোঁজ করবার মত কোন তত্ত্ব নয়। কোন দরকার নেই। যে জায়গাটা বীথিকার কাছে আজ নিছক একটা প্রয়োজনহীন শ্মশান মাত্র, সে জায়গার ধুলো মাড়িয়ে আর হাঁটাহাটি না করাই ভাল।

শরীরটা ভাল নেই, সৌম্যেনকেও বুঝিয়ে শান্ত করে বীথিকা,

ক'দিন বাড়ির বাইরে ছুটোছুটি না করে…তার চেয়ে…সূর্যমুখীর জঙ্গলের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগবে মনে হয়।

দুটো দিন পার হয়ে গেলেও, সৌম্যেনের সঙ্গে বাড়ির বাইরে কোথাও বেড়াতে যায় নি বীথিকা। সারাটা দিন ওরা দুজনে বাড়ির ভিতরে, কিংবা বারান্দায়, কিংবা কুয়োতলার সব্জী-ক্ষেতের ধারে ধারে ঘুরে-বেড়িয়ে গল্প করেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, কাকিমার চোখের ভয়-ভয় সতর্কতার ভাবটা তবু মুছে যায় না। গেট খোলার শব্দ শুনলেই কাকিমা যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ঘরের জানালার কাছে এসে উঁকি দিয়ে তাকান। যেন সন্দেহ করেছেন, বীথিকা আর সৌম্যেন বুঝি সত্যিই বাইরে বেড়াতে চলে গেল।

কাকিমার কাছে এসে বীথিকা বলে—কাকিমা কি-যেন ভাবছো বলে মনে হচ্ছে?

কাকিমা—না, ভাবনার কোন কথা নয়। তবে…।

—কি?

—বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করেছি বলে রাগ করনি তো?

—রাগ করিনি, কিন্তু তুমিই বা এত ভয়ে ভয়ে কথা বলছো কেন?

—ভয় এই যে, তোমাকে দেখতে পেলে অভিজিৎ বোধহয় চিনে ফেলতে পারবে।

চমকে ওঠে বীথিকা—কেন? পাগল কি ভাল হয়ে গেছে?

—একটুও ভাল হয়নি; তবে পাগলামির রকম বদলেছে।

—তার মানে?

—আজকাল আর ফিলসফির বই-টই ছোঁয় না। সারাক্ষণ শুধু একগাদা চিঠি নিয়ে……।

—কি বললে?

—অভিজিৎ-এর মা বললেন, তোমারই লেখা সেই চিঠিগুলি

খুলে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছে অভিজিৎ, আর, যখন-তখন, প্রায় সব সময়, চিঠিগুলি পড়ছে।

বীথিকার চোখের তারা দুটো হঠাৎ একেবারে অচঞ্চল হয়ে যেন একটা ভয়াল কৌতুকের কালো-ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কাকিমা বলেন—পাগলামি বরং বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। যখন-তখন হাত তুলে কি-যেন ধরতে চায়, বিড় বিড় করে আর চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে বীথিকা—বদ্ধ পাগল।

কাকিমা—হ্যাঁ, অভিজিৎ-এর মা বললেন, বোধ হয় চা খাওয়ার জন্য এরকম কাণ্ড করে অভিজিৎ। হাত তুলে চায়ের কাপ পেতে চায়। অভিজিৎ-এর মা এক কাপ চা নিয়ে এসে হাতের কাছে যখন তুলে ধরেন, তখনও অবুঝের মত ফ্যাল ফ্যাল করে মা'র মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

বীথিকা যেন একটা ছটফটে নিঃশ্বাসের জ্বালা চেপে প্রশ্ন করে—চা খায় না?

—খায়!

—কথা বলে না?

—না।

—কারও খোঁজ করে নি?

—কি বললে? হ্যাঁ…না…তবে একটা কাণ্ড করেছে।

—কি?

—তোমারই একটা ফটো, একটা রুমাল, একটা চিরুণি, আর কাশির ওষুধের একটা শিশিকে ঠিক চিনতে পেরেছে। সেগুলিকে একসঙ্গে জড়ো করে টেবিলের দেরাজের ভিতরে রেখেছে।

—ওসব ছাইপাশ ও-বাড়িতে পড়ে ছিল নাকি?

—নিশ্চয় ছিল, তা না হলে পাবে কেমন করে?

—তোমাদেরও মাথা খারাপ।

—কি বললে ?

—ও ছাইপাশ ও-বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে আসনি কেন ?

—অত কি মনে থাকে ছাই। যাক্‌গে, ওতে কি আসে যায় ? সৌম্যেন চা খেয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—সৌম্যেন তোমাকে ডাকছে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—যাও তাহলে।

—যাচ্ছি।

যাবার জন্যে কিন্তু ব্যস্ত হয়ে ওঠে না বীথিকা। বীথিকার প্রাণটা যেন ভয়ানক এক আলস্যের ভারে নিথর হয়ে গিয়েছে। পাগল অভিজিৎ-এর মন অনস্তুতার জিজ্ঞাসা ছেড়ে দিয়ে এ কোন্ ভয়ানক ফিলসফির মধ্যে ডুবেছে !

কাকিমা চলে যান। সৌম্যেনের চেঁচিয়ে-ডাকা আহ্বানের স্বর তখনো বেজে চলেছে—বীথি, বীথি, তুমি কোথায়, একবার এখানে এস। বীথিকা কিন্তু চুপ করে বসেই থাকে।

উঃ, হঠাৎ দুহাত দিয়ে চোখ চেপে ধরে যখন ছটফট করে উঠেছে বীথিকা, ঠিক তখন কাকিমা এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন ; আর ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—একি ? কি হলো বীথি ?

ছলছল করছে বীথিকার চোখ।—এ কী সাংঘাতিক পাগলামি ; পাগলামি নয় বলেই যে মনে হয়।

কাকিমা হাসতে চেষ্টা করেন—ছিঃ, পাগলা মেয়ে, তুমি আবার ওসব কথা এত বাড়িয়ে ভাবছো কেন ? ডাক্তার বলেছে, অভিজিৎ-এর পাগলভাব একটুও সারেনি।

আবার হাঁপ ছাড়ে বীথিকা।—ভাল কথা।

কাকিমা—সৌম্যেন যে চা চাইছে, শুনতে পাওনি ?

বীথিকা—শুনেছি। যাচ্ছি।

কিন্তু কাকিমা চলে গেলেও বীথিকা চলে যায় না। ব্যস্ত হয়ে ওঠবার প্রাণটা যে সত্যিই অলস হয়ে গিয়েছে। বোধহয় ভাল লাগে না এত ব্যস্ততাময় ভালবাসার হাঁক-ডাক, এত ছুটোছুটি আর এত মেশামেশি। সবাই পাগল। কেউ শুধু স্তব্ধতা আর নীরবতার মধ্যে পাগল হয়ে আছে, কেউ শুধু মুখরতা আর ব্যস্ততার মধ্যে পাগল আছে। এই তো পার্থক্য। কে পাগল নয়?

টেবিলের উপরে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল বীথিকা। ঠিক ঘুম নয়, ছেঁড়া ছেঁড়া কাটাকাটা কতগুলি তন্দ্রালু ভাবনার ভারে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনন্ততার রহস্য বুঝে নেবার জন্যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর আশা করছে পাগল। স্ত্রী বলছে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অনন্ততার কথা ভুলে যাও। আমিই যে তোমার……। বীথিকার তন্দ্রাটা যেন বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে।

এ কি? বীথিকার কাঁধের উপর একটা তোয়ালে আছড়ে পড়েছে। মুখ তুলে তাকায় বীথিকা। ঘরে কেউ নেই। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা নেই, কাকিমা আবার ঘরে ঢুকেছিলেন। স্নান করবার জন্য তাগিদ জানিয়ে দিয়ে গেলেন কাকিমা।

বিকাল যখন হয়, তখন বুঝতে পারে বীথিকা, ছিঃ, কী বিশ্রী ভুল! সৌম্যেনের ডাকে সাড়া দিতে আজ ভুলেই গিয়েছে বীথিকা। আর চা নিয়ে সৌম্যেনের কাছেও যেতে পারেনি। যাক্‌গে; হয় কাকিমা, নয় ঠাকুর রামজীবন নিশ্চয়ই সৌম্যেনের চা পৌঁছে দিয়েছে।

কিন্তু তখনই আবার ডাক শোনা যায়—বীথি, বীথি। ডাকছে সৌম্যেন। কোন সন্দেহ নেই, এখন আর বাড়ির ভিতরে কিছুতেই থাকবে না সৌম্যেন! হয় সূর্যমুখীর জঙ্গলের আশে-পাশে, নয় কুয়োতলার সব্জীক্ষেতের কাছে সৌম্যেনের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে গল্প করতে হবে। শুধু আজ নয়; আরও চারটে দিন ভালবাসার

ব্যস্ততা আর মুখরতার একঘেয়ে পাগলামির সঙ্গে মিলে-মিশে চলতে হবে। সৌম্যেনের ছুটি ফুরোতে আরও চারটে দিন বাকি।

মিররের সামনে দাঁড়িয়ে সাজতে দেরি করে না বীথিকা। ফিকে নীল শিফনের সাড়ি ; জানে বীথিকা, এই সাড়িতে বীথিকাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। অনেকদিন হলো খোঁপার ছাঁদ নিয়ে মাথা ঘামায়নি বীথিকা। আজ কিন্তু মনে হয়, দড়িদড়া দিয়ে বাঁধাছাদা না করে খোঁপাটাকে ঢিল করে আর দুটো পিন দিয়ে কাঁধের উপর এলিয়ে দিলেই ভাল দেখাবে।

কিন্তু সাজতে গিয়ে যে সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল। এত পরিপাটি করে সাজবার তো কোন ইচ্ছা ছিল না বীথিকার। সৌম্যেনের হাঁকডাকও আর শোনা যায় না। ভদ্রলোক একাই বেরিয়ে গেল নাকি ?

কদমডিহির পাহাড়ের মাথা থেকে সন্ধ্যারাগের শেষে আভাটুকুও সরে গেল। গেটের মাথার বাতিটা জ্বেলে দিয়েছে চাকর পরশুরাম। সুর্যমুখীর জঙ্গলটা উসখুস করছে, অদ্ভুতরকমের ছেঁড়াছেঁড়া চৈতী বাতাস বইতে শুরু করেছে।

গেটের দিকে দুই চোখ প্রায় অপলক করে আর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে বীথিকা। সঙ্গে সঙ্গে বীথিকার সুন্দর মুখের উপর সুন্দর করে মাখানো পাউডারের পরমাণুগুলি যেন অদ্ভুত এক ইচ্ছার জ্বালায় লালচে হয়ে যায়। ছি ছি, কী সাংঘাতিক ভুল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে, অন্তত অশোক গাছটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মানুষটাকে শুধু একবার চোখে দেখে আসতে ভুলে গিয়েছে বীথিকা। কিন্তু······দূরে দাঁড়িয়ে কেন ? একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে একবার বলে দিয়ে এলেই তো হয়, তুমি আর এসব চিঠি পড়ো না, এই সব যত ছাই-পাঁশ ভঙ্গুরতা নশ্বরতা আর সান্তা। যতসব চমৎকার মিথ্যা। তোমার স্পিনোজা কাণ্ট আর অনন্ততার

জিজ্ঞাসা নিয়েই তুমি পড়ে থাক। তুমি তো পাগল নও, তবে এটুকু বুঝতে পার না কেন যে, আমি মরে গিয়েছি।

এগিয়ে যায় বীথিকা।

গেট খোলবার জন্য হাত তুলতেই যেন একটা ছায়া ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বীথিকার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। চমকে উঠে হাত নামিয়ে নেয় বীথিকা। গলার স্বরও চমকে ওঠে। —কে?

—আমি। উত্তর দেয় সৌম্যেন।

—কি হলো? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে বীথিকা।

সৌম্যেন হাসে—আমিই তো জানতে চাই, কি হলো? একা একা কোথায় চললে তুমি?

সৌম্যেনের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বীথিকা। —কোথাও যাচ্ছি না। কিন্তু……।

—কি?

—আমি এখানে একা একা থাকতে পারবো না।

—তার মানে?

—আমিও তোমার সঙ্গে সিলিঘাটে যাব।

—বেশ তো, এখনও তো ছুটির আরও চারটে দিন……।

—না, আজই চল।

—কিন্তু, কাকিমা বড় দুঃখ পাবেন।

—না, কাকিমাকে আমি বুঝিয়ে দেব।

—কাকিমা কি সত্যিই বুঝবেন?

—খুব বুঝবেন। মনে হচ্ছে, বুঝেই ফেলেছেন।

কুটিল পন্থ

এই সহরের অনেকের চিন্তায় একটা বিস্ময়ের প্রশ্ন প্রায়ই দেখা দিয়ে থাকে। দশ জন ভদ্রলোক কোন উপলক্ষে একঠাঁই হলেই তাঁদের মধ্যে কথায় কথায় সেই বিস্ময়ের প্রসঙ্গটাও হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।—সত্যি, কিছু বুঝতে পারা যায় না মশাই ; মানুষের এত মহৎ একটা কাজ এত ব্যর্থ হতে পারে? ভাল কাজের পরিণামও এত খারাপ হয়?

প্রশ্নটাকে বিস্ময়ের প্রশ্ন না বলে একটা ধাঁধার প্রশ্ন বলা যায়। ক্লাবের বৈঠকে, যেকোন উৎসবের জনসমাবেশে, কোন ক্রিয়া-বাড়ির ভিড়ের মধ্যে, কেউ না কেউ এই ধাঁধার প্রশ্নটাকে কথাবার্তার মাঝখানে টেনে আনবেই ; আর তাই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলবেই। সত্যিই তো, প্রসন্নববুর মত মানুষের এত বড় আত্মোৎসর্গের ফল শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল, তাতে তো এই বিশ্বাসই করতে হয় যে, মহত্ত্বের কোন সার্থকতা নেই। মহৎ কাজও পাপের সহায় হতে পারে। মহৎ কাজের পরিণামে মানুষের ক্ষতিও হতে পারে।

সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায় বসে ভদ্রলোকেরা যখন দেখতে পান যে, এক মাতাল যুবকের মূর্তি টলতে টলতে চলে যাচ্ছে, তখন ভদ্রলোকদের আলোচনা ক্রুদ্ধ ধিক্কারের মত তপ্ত হয়ে ওঠে—ছি, প্রসন্নবাবুর প্রাণদানের ফল শেষে এই দাঁড়াল? নিজের প্রাণ দিয়ে একটা পাপীর প্রাণকে বাঁচিয়ে রেখে গিয়েছেন প্রসন্নবাবু।

অনেকেরই মনে পড়ে, উনিশ বছর আগে, এই লাইব্রেরীর সামনের ওই মাঠের উপর সহরের পাঁচ হাজার মানুষ এসে ভিড় করেছিল। সেই জনসভায় প্রসন্নবাবুর মহান্ আত্মদানের জন্য শ্রদ্ধার প্রস্তাব

গ্রহণ করেও অনেকের চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। দশ বছর বয়সের একটা ছেলের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সেদিন সকালে নিজের প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রসন্নবাবু।

খাজাঞ্চী পুকুর নামে ওই পুকুরের জল থেকে গোপাল দত্তের ছেলেটা পদ্ম ডাঁটা টানতে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিল। দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজন চেঁচিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই পুকুরের জলে নামতে, তার মানে জলের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে তোলবার জন্য কেউ সাহস করতে পারে নি। পুকুরটা যেমন গভীর, তেমনি পাঁকাল, আর জল তেমনি ঠাণ্ডা। তা ছাড়া জংলা জলজেও ভরা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, হার্টের কষ্টে গত বছরেও যিনি তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলেন, সেই প্রসন্নবাবু পুকুরের জলে ঝাঁপ দিলেন। দশ মিনিট ধরে জল তোড়পাড় করে আর ডুব দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে খুঁজলেন। তারপর সত্যিই খুঁজে পেলেন। পাঁকমাখা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে আর সাঁতার দিয়ে পুকুরের কিনারায় এসে উঠলেন। কিনারার লোকজনের হাতে ছেলেটাকে সঁপে দিয়ে, জোরে একটা হাঁপ ছাড়লেন প্রসন্নবাবু। যারা সেদিন সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা আজও স্মরণ করতে পারে, প্রসন্নবাবুর মুখে কী অদ্ভুত একটা আনন্দের হাসি তখন ঝিকমিক করছিল।

ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; আর, এক ঘণ্টার পরেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সেই ছেলেটা চোখ মেলে তাকিয়ে কথা বলেছিল। ডাক্তার খুশি হয়ে হেসেছিলেন। কিন্তু সেই ডাক্তারকে তখনই আবার ছুটে যেতে হয়েছিল! তখনই খবর পেয়েছিলেন ডাক্তার; নিদারুণ খবর। প্রসন্নবাবু মারা গিয়েছেন।

প্রসন্নবাবু মুখের সেই অদ্ভুত হাসির ঝিকিমিকি হঠাৎ থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠেছিল। পুকুরের কিনারাতে মাটির উপর হঠাৎ বসে পড়েছিলেন প্রসন্নবাবু। তারপরেই শুয়ে পড়েছিলেন; তারপরেই

জোরে একটা হাঁক ছেড়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পুকুরের কিনারার সেই ভিড় আর্তনাদ করে উঠেছিল।

সহরের ঘরে ঘরে সারাদিন ধরে এই আক্ষেপই করুণ হয়ে বেজেছিল।—ইস্, কী মানুষের প্রাণটা কিভাবে চলে গেল!

—একটা অজানা অচেনা শিশুর প্রাণের জন্য নিজের প্রাণ কত সহজে বলি দিলেন ভদ্রলোক!

—কত বড় হৃদয়ের মানুষ! কী সাহস! কত উদার!

—প্রসন্নবাবুর মত মানুষ পৃথিবীতে এখনও দেখা যায়, এটা যে পৃথিবীরই সৌভাগ্য।

এই সহরের মধ্যে বিদ্যায়, চরিত্রে, আচরণে আর পরোপকারে যিনি সবার সেরা, সবারই শ্রদ্ধার আস্পদ, সেই প্রসন্নবাবু একটা অচেনা ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, ঘটনাটা সেদিন সারা সহরের শোকের মধ্যেও যেন একটা বিস্ময়-বিহ্বল আনন্দাশ্রুর সজলতা ফুটিয়ে তুলিয়েছিল। এমন মহত্ত্বের ঘটনা ইতিহাসের কাহিনীতে শোনা যায়; প্রসন্নবাবুও যেন মানুষের ইতিহাসের গৌরব। তিনি প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন, মানুষ সত্যিই এত মহৎ হতে পারে।

প্রসন্নবাবুর নিজেরও সংসার আছে। স্ত্রী আছে, ছেলে আছে, পাঁচ বছর বয়সের একটি মেয়ে আছে। সহরের ঘরে ঘরে মেয়েরা চোখের জল ফেলে এমন কথাও সেদিন বলেছিল, হায় রে, প্রসন্নবাবু নিজে মরে গোপাল দত্তের ছেলেকে বাপের কোলে তুলে দিয়ে গেলেন; কিন্তু প্রসন্নবাবুর নিজের মেয়েটা যে চিরকালের মত বাপের কোলছাড়া হয়ে গেল।

সত্যিই, সেদিন প্রতিবেশীরাও শুনতে পেয়েছিল, প্রসন্নবাবুর ছোট্ট মেয়েটা, পাঁচ বছর বয়সের অরুণা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে; তুমি কোথায় চলে গেলে বাবা; ফিরে এসো বাবা, আমি যে তোমার কোলে বসবো বাবা।

এই লাইব্রেরী ঘরের দেয়ালে প্রসন্নবাবুর একটা ফটো আজও ঝুলছে। লাইব্রেরীটা প্রসন্নবাবুরই চেষ্টার সৃষ্টি। লাইব্রেরীর ঘরের ভিতরে দুটো আলমারিতে গ্রীক-সাহিত্যের যে-সব বই সাজানো রয়েছে, সেগুলিও প্রসন্নবাবুর দান। তিনি নিজে গ্রীক-সাহিত্য ভালবাসতেন। এই সহরেরই কলেজের লজিকের অধ্যাপক ছিলেন প্রসন্নবাবু। যেমন চমৎকার সুশ্রী চেহারা, তেমনই সুন্দর গলার স্বর। ভদ্রলোকেরা আজও মনে করতে পারেন, এই লাইব্রেরী ঘরেতে এক একদিন এসে প্রসন্নবাবু হোমর আবৃত্তি করে সকলকে কেমন মুগ্ধ করে চলে যেতেন।

সেই মানুষটারই প্রাণ, এত মূল্যবান আর মহৎ প্রাণ যেদিন গোপাল দত্তের ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজে শেষ হয়ে গেল, সেদিন কেউ কোন কল্পনাতেও এই সন্দেহ করতে পারে নি যে, এত মহৎ আত্মদান এত ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওই যে, যার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণ নষ্ট করেছিলেন প্রসন্নবাবু, সেই প্রাণীটাই আজ টলতে টলতে চলে যাচ্ছে। বোধ হয় জুয়ার আড্ডা থেকে ফিরছে, কিংবা কোথায় কোন্ গুণ্ডামি করে আর মানুষের সর্বনাশ করে এতক্ষণে ঘরে ফিরছে, কে জানে? ঘরে ফিরছে, না অন্য কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার জন্য যাচ্ছে, তাই বা কে বলতে পারে?

লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায় বসে ভদ্রলোকেরা ক্ষুব্ধ ভাবে আক্ষেপ করেন, একটা হতভাগা পাপীর প্রাণের জন্য প্রসন্নবাবু প্রাণ দিয়েছিলেন। ছি, ছি, মানুষের এত মহৎ আত্মদানও এত ব্যর্থ হয়!

গোপাল দত্ত আজ আর বেঁচে নেই। গোপাল দত্তের সংসারের আর কেউই আজ বেঁচে নেই। ওদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ওরা মরে গিয়ে বেঁচেছে। গোপাল দত্তের আর এই অভিশাপের মূর্তিকে নিজের চোখে দেখবার দুর্ভাগ্য হয় নি। বেঁচে থাকলে, গোপাল দত্তকে আজ শুনতে হত, সহরের মানুষ তাকে নরেশ গুণ্ডার বাপ বলে ডাকছে।

প্রসন্নবাবুর মহান আত্মদানের পরিণাম হল, ওই নরেশ গুণ্ডা। লোকে বলে, সেদিন খাজাঞ্চী পুকুরের পাঁকের মধ্যে ডুবে যাওয়া ওই ছেলের মরে যাওয়াই ভাল ছিল। তাহলে নরেশ গুণ্ডার এই চেহারা আর এই মাতলামি দেখবার দুর্ভাগ্য কাউকে সহ্য করতে হত না। নরেশ গুণ্ডা এই সহরের ভদ্রজীবনের একটা কলঙ্ক। নরেশ একটা পশুপ্রায় অস্তিত্ব। না জানে লেখাপড়া, না জানে কোন কাজ, শুধু জুয়া খেলে, আর, আরও কি যে করে সেটা পুলিশই ভাল জানে। একবার পুলিশ থেকে অর্ডার হয়েছিল, নরেশকে পাঁচ বছরের জন্য এই সহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, হতভাগা নরেশ পুলিশেরই বিরুদ্ধে মামলা করে জিতে গেল। হাকিম রায় দিলেন, পুলিশ এমন কোন প্রমাণ দিতে পারে নি, যার জন্যে নরেশ দত্তকে সহরের পক্ষে অবাঞ্ছিত বলে মনে করা যেতে পারে।

এটাও একটা কথা। ভদ্রলোকেরা অবশ্য স্পষ্ট করে বলতে পারেন না, হতভাগা নরেশ কার কোন্ ক্ষতি করেছে ও করছে। চোখের সামনে যা দেখা যায়, তাতে শুধু বোঝা যায় যে, নরেশ শুধু নিজের জীবনটাকেই ক্ষতাক্ত ছিন্নভিন্ন ও ক্লেদাক্ত করে তুলেছে। নরেশ শুধু নিজেরই অভিশাপ। ওর সঙ্গে কোন ভদ্র যুবক কথা বলে না। কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে ওর নিমন্ত্রণ নেই। সহরের ছেলেরা যেদিন স্বাধীনতার উৎসব করে, সেদিনও দেখা যায়, নরেশ টলতে টলতে চলে যাচ্ছে। নরেশের পকেটের ভিতর থেকে একটা বোতলের মুখ উঁকি দিয়ে রয়েছে।

অরুণাও প্রায়ই দেখতে পায়, টলতে টলতে চলে যাচ্ছে মাতাল নরেশ, মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ, ধুতিটা কাদা-মাখা। কে জানে কোথায় মারামারি করে কিংবা কোন্ নর্দমার কিনারায় গড়াগড়ি করে, আহত জানোয়ারের মত মূর্তি ধরেছে নরেশ। অরুণার চোখ দুটো যেন দুঃসহ একটা ঘৃণার জ্বালায় কেঁপে ওঠে। মনে পড়ে যায়, এই অমানুষটাই বাবার মৃত্যুর কারণ। এ হেন একটা কদর্য প্রাণীকে

বাঁচাবার জন্যেই প্রসন্নবাবুর প্রাণ দিয়েছে। শুধু আজ নয়, সেই পাঁচ বছর বয়সের জীবন থেকে অরুণার মনের ভিতরে একটা ক্ষমাহীন আক্রোশ ঘনিয়ে আছে। মানুষের অনেক মঙ্গল হত, পৃথিবীর কারো কোন ক্ষতি হত না, যদি সেদিন এই প্রাণীটাই পুকুরের পাঁকের ভিতরে তলিয়ে গিয়ে, মরে পচে আর গলে যেত। এই সহরের মানুষ আজও বলাবলি করে, প্রসন্নবাবু আজ বেঁচে থাকলে এই সহরের কত মানুষের কত উপকারই না তিনি করতেন।

অরুণাদের এই বাড়ির অদৃষ্টটাকেও কত না কাঁদতে হয়েছে, আর ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। প্রসন্নবাবু ওভাবে মরণ বরণ করবার পর সংসারের দায় দাবি মেটাতে গিয়ে মা'র সব গহনা একে একে বেচে দিতে হয়েছে। নদীর ধারে এগারো বিঘা জমি ছিল, তাও বিক্রি করে দিতে হয়েছে। মামাদের কাছে সাহায্য চাইতে হয়েছে। মামারা অনেক কথা শুনিয়েছেন আর মাঝে মাঝে সামান্য সাহায্য করেছেন, তবে বড়দার লেখাপড়ার খরচ মেটাতে পারা গিয়েছে। বাবা বেঁচে থাকলে বড়দাকে আজ ষাট টাকা মাইনেতে আদালতের কেরানীর কাজ করতে হত না। এম-এ পাশ করতে পারতেন বড়দা, আর এতদিনে একটা ভাল চাকরি নিয়ে সুখী হতে পারতেন।

বড়দা যখন শীতের দিনে একটা ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে দিয়ে আদালতের কেরানীগিরি করতে বেরিয়ে যান, তখন অরুণার ব্যথিত মনটা যেন বাবার উপরেই একটা অভিমানের ঘোরে বিড়বিড় করতে থাকে, চোখ দুটোও ছলছল করে : তুমি ভয়ানক ভুল করেছিলে বাবা, গোপাল দত্তের ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তোমার প্রাণ দেওয়া একটুও বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। তোমার মহত্ত্বের ভুলে সবারই ক্ষতি হয়েছে। কারো কোন ভাল হয় নি। এমন কি, ওই নরেশেরও কোন উপকার হয় নি। সেটা আজ গুণ্ডা হয়ে এই সহরের অভিশাপ হয়েছে।

বাড়ির বারান্দায় কিংবা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পথের দিকে

তাকালেই দু-সারি শিরীষের চেহারা চোখে পড়ে। ফুল ফোটে যখন, তখন বাড়ির সামনের ওই পথের সব আলো-ছায়া আর ধুলোও যেন রঙীন হয়ে যায়। শিরীষের ফুলের গুচ্ছগুলি যেন গুচ্ছ গুচ্ছ আনন্দের রক্তিমা; সে রক্তিমা মাঝে মাঝে যেন আভাময় হয়ে অরুণার মুখের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে।

শুধু ফোটা শিরীষের আনন্দরক্তিমার জন্য নয়; অরুণা জানে, কলকাতা থেকে ধীরাজ ফিরেছে। আজই বোধ হয় এসে দেখা করবে। তারপর পুরো একটা মাস ধরে রোজই আসবে ধীরাজ; তারপর একদিন কলকাতায় চলে যাবে। ধীরাজের কথা মনে পড়লেই অরুণার সুন্দর মুখটা যেন লালচে হয়ে আরও সুন্দর হয়ে যায়।

পথের দিকে তাকালে শুধু যে মূর্তিমান অভিশাপ ওই নরেশকেই দেখতে হয়, তা নয়। বছরের মধ্যে অন্তত এমন পাঁচটে মাস আসে যখন রোজই ধীরাজকে দেখতে পাওয়া যায়। শিরীষের ছায়া পার হয়ে অরুণাদের বাড়ির ফটকের কাছে এসে ধীরাজ যখন তার সুস্মিত চোখের দৃষ্টি তুলে বারান্দার দিকে কিংবা জানালার দিকে তাকায়, তখন ধীরাজের সোনার ফ্রেমের চশমাটাও ঝিক্‌ঝিক্ করে সোনালী হাসি হাসতে থাকে।

এগিয়ে আসে অরুণা—এত দেরি হল কেন?

ধীরাজ—দেরি? চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে, এই সকাল আটটাতে হাজির হয়েছি, তবু বলছো দেরি হয়েছে?

অরুণা—এখনও চক্ষুলজ্জায় ভুগছো?

ধীরাজ হাসে—হ্যাঁ, কিন্তু আর নয়। এইবার বড়দাকে বলে দেওয়াই উচিত।

বড়দাকে যে-সত্যটা আজও দু-জনের কেউ কোনদিন বলতে পারে নি, সে-সত্যটা বড়দার অজানা নয়। শুধু বড়দা কেন, প্রতিবেশীদেরও অজানা নয়। সকলেই জানে, ধীরাজের সঙ্গেই অরুণার

বিয়ে হয়ে যাবে। হওয়াই উচিত। ধীরাজের মত ভাল ছেলেকে অরুণার মত ভাল মেয়ের সঙ্গেই সবচেয়ে ভাল মানায়।

অরুণাও যেন মনে-প্রাণে অনুভব করেছে, অরুণার জীবনে ধীরাজের ভালবাসার উপহার যেন একটা সৌভাগ্যের উপহার। অরুণার প্রাণ কল্পনায় যা আশা করেছিল, ধীরাজ যেন সেই আশারই দান। তিন বছর ধরে ধীরাজের ভালবাসার আশ্বাসে আর অঙ্গীকারে অরুণার দিন-রাতের ভাবনার মুহূর্ত্তগুলি যেন মুগ্ধ হয়ে অরুণাকে মুগ্ধ করে রেখেছে।

তিন বছর আগের দিনগুলিকে স্মরণ করতে পারে অরুণা। কি ভয়ানক উদাস আর অর্থহীন এক একটা দিন! কিছুই ভাল লাগত না। কতবার ওই শিরীষের মাথা ফুলে ভরে গিয়ে লাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখে একটুও ভাল লাগে নি। জীবনটাকেই যেন অর্থহীন বলে মনে হত। মিছিমিছি বেঁচে থেকে লাভ কি, এমন ভয়ানক প্রশ্নও বারবার মনের ভিতর কত না উৎপাত ঘটিয়েছে। সারাদিন ধরে বই পড়ে আর কাজ করেও যেন একটা শূন্যতার মধ্যে মনটা ছটফট করেছে।

আজ কিন্তু মনে হয়, যে-পৃথিবীতে ধীরাজ আছে, সে-পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার দরকার আছে। ধীরাজের ভালবাসা এসে শুধু অরুণার জীবনের শূন্যতাকে নয়, এই পৃথিবীটাকেই যেন শত তৃপ্তিতে ভরে দিয়েছে।

তিন বছর ধরে অপেক্ষা সহ্য করেছে দুজনের জীবন, অরুণার আর ধীরাজের জীবন, কিন্তু আর অপেক্ষার দরকার কি? ধীরাজ একটা চাকরিও পেয়ে গিয়েছে, রেলওয়ের চাকরি, মাইনে ভাল। শিলিগুড়িতে যে কোয়ার্টার পেয়েছে ধীরাজ, সেই কোয়ার্টারও সুন্দর ছবির মত দেখতে একটা রঙীন কটেজ; ফটকের দু-দিকে ঝাউ, পিছনে দেবদারুর কুঞ্জ; আর দেয়ালের গায়ে লতানো গোলাপ।

বড়দার কাছে মুখ খুলে বেশি কথা বলতে হয় নি। ধীরাজের লজ্জাবিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে বড়দা খুশি হয়ে হেসে ফেললেন—

খুব ভাল কথা। আমার মনে হয়, এই মাঘের শেষ দিকে কোন একটা দিনে বিয়ে হয়ে গেলে ভাল হয়; কারণ চাটুজ্জে মশাই এসে কাজে জয়েন না করা পর্যন্ত আমি ছুটি পাব না।

ধীরাজ বলে—তাই ভাল। আমারও ফাল্গুনের শেষ দিকে শিলিগুড়িতে গিয়ে কাজে জয়েন করবার কথা।

শান্ত সহরটা আতঙ্কিত হয়েছে। পুলিশও উদ্বিগ্ন। গোয়েন্দা পুলিশ সহরের যত বাজার, বস্তি, সরাইখানা আর ধর্মশালার উপর দিনরাত নজর রাখছে।

তিন তিনটে অদ্ভুত রকমের খুন এই এক মাসের মধ্যেই হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, এই সব খুন কোন পাকা খুনীর, কোন ভয়ানক নিষ্ঠুর হিংস্রের কীর্তি। প্রথম খুনঃ বস্তির একটা ঘরে; মুড়ি বেচতো যে চারু বৈরাগিনী, তাকে কে যেন খুন করে, তার রূপোর গোপালকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। লোকে বলছে, রুপোর গোপালের মাথায় দু-ভরি সোনার একটা মুকুট ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা সরাইখানাতে। এক মাস হল এক বাঈজী এসে সরাই-খানাতে ছিল! এক সকালবেলায় দেখা গেল, বাঈজীর ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মেঝের উপর মরে পড়ে আছে বাঈজীটা বাঈজীর গায়ের সব গয়নাও অদৃশ্য।

তৃতীয় ঘটনা, নদীঘাটার এক দোকানবাড়িতে। দোকানদারের বউকে ঘরের ভিতরে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ঘরের জানালাটা ভাঙা। আর লোহার সিন্দুকের ভিতর থেকে সব টাকা উধাও। দোকানদার সে-রাত্রিতে বাড়িতে ছিল না, গুড় কিনতে রাজপুরে গিয়েছিল।

তিনটে ঘটনাই হল, ঘুমন্ত মানুষকে খুন করবার ঘটনা। একই রকমের খুন, গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে খুন করা।

পুলিশ হয়রান হয়েছে ; হতাশও হয়েছে। এই ভয়ানক খুনীর কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ।

ধীরাজের কাকা আর মেজদি এসে যেদিন অরুণাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন, সেদিন ঠিক সন্ধ্যার পরেই থানার পুলিশ অরুণাদের বাড়ির দিকে ছুটে এল। সহরের লোক ছুটে এসে অরুণাদের বাড়ির ফটকের কাছে পথের উপর ভেঙে পড়ল। ধরা পড়েছে সেই ভয়ানক খুনী।

সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে কেউ ছিল না। ছিল শুধু অরুণা। আশীর্বাদের সেই সোনার হারটা গলায় পরে বাইরের ঘরেই একটা কোচের উপরে বসেছিল অরুণা। ঘরে আলো জ্বলছিল ; অরুণার হাতে একটা বই ছিল। কিন্তু চোখ বন্ধ করে যেন একটা স্বপ্নময় আবেশের মধ্যে নিথর হয়ে বসেছিল অরুণা। অরুণার প্রাণটা যেন সেই আবেশের মধ্যে সুস্থির হয়ে সানাইয়ের সুর শুনছে। কালই যে অরুণার বিয়ে।

এসেছিল ধীরাজ। বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে অরুণার সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল।

কিন্তু চমকে উঠল ধীরাজ। ঘরের এক কোণে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা সাধু ; কপালে তিলক, মাথায় জটা, আর হাতে একটা দড়ি ; দড়িতে মোটা মোটা কয়েকটা রুদ্রাক্ষ বাঁধা।

ঘরের ভিতরে ঢুকে সাধুটার চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় ধীরাজ। সাধুটা সেই মুহূর্তে কোমর থেকে একটা চক্‌চকে ভোজালি বের করে ধীরাজের দিকে হিংস্রভাবে তাকায়।

কিন্তু ধীরাজ সেই মুহূর্তে সাধুর সেই হিংস্র চোখের দৃষ্টিকে প্রচণ্ড এক ঘুসির আঘাতে অন্ধ করে দিয়ে, সাধুর হাতের ভোজালি চেপে ধরে। জেগে ওঠে, চেঁচিয়ে ওঠে অরুণা। আর, অরুণার সেই আর্ত-চিৎকারের শব্দ শুনে পাশের বাড়ির নন্দবাবু, হেমেন, নিকুঞ্জ আর শিবপদ ছুটে আসে। সাধুটাকে মেঝের উপর আছড়ে দিয়ে আর দড়ি দিয়ে বাঁধাছাদা

করে হাঁপ ছাড়ে হেমেন আর নিকুঞ্জ, আর শিবপদ পুলিশকে খবর দিতে চলে যায়। হেমেনের ডাক শুনে পথের মানুষ ছুটে আসতে থাকে।

খুনী ধরা পড়েছে। ভিড়ের মানুষ বলাবলি করে, হ্যাঁ, এই সাধুটা মাস দুই হল কোথা থেকে যেন এই সহরে এসেছে।

খুনী সাধুটাকে নিয়ে পুলিশ যখন চলে যায়, আর পথের ভিড় শূন্য হয়ে যায়, তখন বাড়ির বারান্দার উপরে শুধু অরুণা আর ধীরাজ। ঘরের ভিতরে বড়দা। ফটকের কাছে শিরীষের মাথা মৃদু ঝড়ের ছোঁয়া লেগে দুলছে; ঝিরিঝিরি শব্দ করছে শিরীষ। হঠাৎ যেন একটা দৈব মায়া কোথা থেকে ছুটে এসে অরুণার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে; যেন সেই খুশির উল্লাসের ছোঁয়া লেগেছে শিরীষগুলির মাথায়।

ধীরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণাও যেন একটা বিস্ময়ের আবেশ সহ্য করতে থাকে।

ধীরাজ বলে—কি দেখছ?

—দেখছি তোমাকে।

—কেন?

—তুমি যে সত্যিই আমার প্রাণটাকেও কিনে নিলে।

—কেন?

—তুমিই যে আমার প্রাণ বাঁচালে, তুমি আজ এসে না পড়লে…

সত্যিই, থর্‌থর্ করে কেঁপে ওঠে অরুণার চোখের দৃষ্টি—আমাকে যে খুনীটা শেষ করে দিয়ে যেত।

ধীরাজ বলে—আমিও ভাবছি, কি আশ্চর্য; ভাগ্যিস হঠাৎ এখানে এসে পড়েছিলাম।

অরুণা—আমিও ভাবছি, কি আশ্চর্য, কেন যে তুমি এলে? তোমার আজ এ-সময়ে আসবার কোন কথা ছিল কী?

ধীরাজ—না।

অরুণা—তাই মনে হচ্ছে, কোন দেবতার কৃপা যেন তোমাকে আজ এখানে পাঠিয়েছিল।

ধীরাজ—তাই হবে। অবিশ্বাস করতে পারছি না। আমার বরং এখন স্টেশনের দিকে যাবার কথা ছিল। ছোট কাকার আজ আসবার কথা।

অরুণা—তবে স্টেশনে গেলে না কেন ?

ধীরাজ—গিয়েছিলাম কিছুদূর পর্যন্ত, কিন্তু শেষে ফিরে আসতে হল।

অরুণা—কেন ?

ধীরাজ—চকের কাছে গিয়ে বাধা পেলাম।

অরুণা—কিসের বাধা ?

ধীরাজ—একটা মারামারি কাণ্ড আর হুল্লোড়। জুয়াড়ী মাতালের দল ইটপাটকেল ছুড়ছে। বিশ্রী জঘন্য কাণ্ড। অগত্যা…

অরুণা—মারামারি করছে কেন ?

ধীরাজ—জুয়াড়ী মাতালেরা যে-জন্যে মারামারি করে; জুয়ার জিৎ আর বখরা নিয়ে মারামারি বাধিয়েছে। দেখলাম সব চেয়ে বেশি মার খাচ্ছে নরেশ গুণ্ডা।

অরুণা—অ্যাঁ ?

ধীরাজ—সেই হতভাগা নরেশ। লোকটা বেপরোয়া হয়ে ছুরি হাতে নিয়ে দশটা গুণ্ডার সঙ্গে লড়ছে, ইস্।

অরুণা—কি ?

ধীরাজ—কিভয়ানক বেপরোয়া গুণ্ডা এই নরেশ! ইঁটের ঘায়ে মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে, একটা পা ভেঙে গিয়েছে, তবু ছুরি হাতে নিয়ে আর রুখে রুখে এতগুলো গুণ্ডাকে তাড়া করছে। যাই হোক, যখন দেখলাম যে, এই জঘন্য মারামারি সহজে থামবার নয়, চকের ভিড়ও শিগগির সরবার নয়, তখন অগত্যা ফিরে আসতে হল।

ওকি ? রাস্তার উপর দিয়ে আবার ওটা কিসের ভিড় এত হৈ-হৈ

করে চলে যাচ্ছে? এক দল পুলিশও যে ভিড়ের আগে আগে চলেছে।

ভিড়ের চিৎকার শোনা যায়, নরেশ গুণ্ডা খতম হয়েছে! খুন হয়েছে নরেশ! মরেছে নরেশ।

হ্যাঁ, পুলিশের পিছু পিছু একটা ঠেলা গাড়িও চলেছে। ঠেলা-গাড়ির উপর পড়ে আছে নরেশ গুণ্ডার লাস।

নরেশের রক্তমাখা মুখটা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ধীরাজ আর অরুণা একসঙ্গে চমকে ওঠে, আর প্রায় একসঙ্গেই চেঁচিয়ে ওঠে—তাই তো, সত্যিই যে নরেশ গুণ্ডা মরেছে!

আবার শিরীষের ঝিরিঝিরি নিঃশ্বাসের বাজনার শব্দ শোনা যায়; কারণ আবার নীরব হয়ে গিয়েছে রাস্তাটা; অনেক দূর চলে গিয়েছে সেই ভিড়, সেই লাসের গাড়ি আর সেই পুলিশ।

অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরাজ হেসে ফেলে—এখন তাহলে বলতে হয়, নরেশ গুণ্ডাই আমাকে স্টেশনে যেতে না দিয়ে এখানে পাঠিয়েছিল।

চমকে ওঠে অরুণা—কি বললে?

ধীরাজ—নরেশটা যদি আজ গুণ্ডাদের সঙ্গে এই ভয়ানক মারামারিটা না বাধাত, তবে···

অরুণার মুখটা হঠাৎ যেন শিউরে ওঠে, আর সেই মুখের উপর ফুটে ওঠা সুন্দর রক্তাভ আনন্দটা যেন একেবারে সাদা হয়ে যায়—কি হত তবে?

ধীরাজ—তবে আমি যে সোজা স্টেশনে চলে যেতাম; আর এদিকে তোমার প্রাণটা একটা খুনীর হাতে শেষ হয়ে যেত।

ছটফট্ করে অরুণা—কি বলছ তুমি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

ধীরাজ এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—মনে হচ্ছে, নরেশ গুণ্ডাটা যেন তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আজ মারামারি করেছে আর মরেছে।

অরুণা আনমনার মত বিড়বিড় করে—একথার কোন মানে হয় না।

ধীরাজ আরও উৎসাহিত হয়ে বলে—মানে একটা হয় বৈকি। নরেশ গুণ্ডা এই ভয়ানক মারামারিটা না বাধালে আমি কি মাঝপথ থেকে ফিরে আসতাম ?

অরুণা—না।

ধীরাজ—আমি না এলে ওই খুনী সাধুটা কি তোমাকে···

অরুণার চোখ ছুটো এইবার থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে—সে কথা ঠিক, তুমি না এসে পড়লে আমার প্রাণ যেত।

ধীরাজ—নরেশটা নিজে মরে গিয়ে আজ তোমাকে বাঁচিয়েছে। এটাই হল দৈবের কৃপা।

অরুণার সারা মুখে যেন একটা যন্ত্রণার ছায়া ছট্‌ফট্‌ করে—হ্যাঁ, ঠিক কথা। অদ্ভুত, আশ্চর্যের কথা।

ধীরাজ—শুনেছিলাম, এই নরেশকেই নাকি বাঁচাতে গিয়ে তোমার বাবার প্রাণ গিয়েছিল।

অরুণা—হ্যাঁ।

ধীরাজও যেন এইবার একটা বিস্ময়ের চমক খেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—তাহলে তো বলতে হয়, তোমার বাবা তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

অরুণার ছুই চোখ জলে ভরে যায়—হ্যাঁ, একটুও মিথ্যে নয়।

ভদ্রা কুণ্ডলকেশা

রাজগৃহ নগরের সেই সুযৌবনা রূপবতীর নাম ভদ্রা।

রাজকোষের অধ্যক্ষের কন্যা ভদ্রা। তার ভ্রমরকৃষ্ণ অলককুণ্ডল সুচারু স্তবকের মত শোভা পায়। তাই মুগ্ধজনের মুখে প্রশস্তির গুঞ্জন শোনা যায়—ভদ্রা কুণ্ডলকেশা। ভদ্রা কুণ্ডলকেশা।

পিতা উদ্বিগ্ন, মাতা বিষণ্ণ, কারণ ভদ্রা কুণ্ডলকেশা বিবাহের প্রস্তাব বার বার প্রত্যাখ্যান করেই চলেছে। পিতা জানেন, মাতাও জেনেছেন, কেন এবং কিসের জন্য ভদ্রা এই রাজগৃহের এতগুলি গুণবান তরুণের অনুরাগ তুচ্ছ করেছে। পাণিপ্রার্থী তরুণদের বিদ্যাবত্তা, শৌর্য, গুণসম্পদ ও চরিত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সব কথাই শুনতে পেয়েছে ভদ্রা। তবু ভদ্রা প্রীত নয়। কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগের আবেশ অনুভব করেনি ভদ্রা। কারণ, এইসব গুণবাণের রূপের প্রতি ভদ্রার মন বিরূপ হয়েছে। কোন পাণিপ্রার্থীর রূপকে রূপ বলেই মনে করতে পারেনি। এবং ভদ্রা কুণ্ডলকেশা তার সুন্দর অধরে বিচিত্র এক ঘৃণা স্ফুরিত করে পিতাকে ও মাতাকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিতে পেরেছে যে, যেপুরুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হবে ভদ্রার চক্ষু, সেই পুরুষের কণ্ঠে বরমাল্য দান করবে ভদ্রা। নচেৎ নয়।

গুণ নয়, বিদ্যা নয়, শৌর্য নয়, চরিত্র নয়, শুধু রূপ। ভদ্রার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পুরুষের এমন এক রূপের প্রতীক্ষায় কালযাপন করছে, যে রূপ ভদ্রার কল্পনাকেও বিস্মিত করে দিয়ে একদিন ভদ্রার উৎসুক চক্ষুর পিপাসা বিচলিত করে দেবে।

কিন্তু তেমন পুরুষের সাক্ষাৎ আজও পায়নি ভদ্রা, এবং ভদ্রার প্রাণে যেন অভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে তার যৌবনময় জীবনের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। বাতায়নপথে দাঁড়িয়ে থাকে সুন্দরী ভদ্রা, এবং দিগ্বলয়ের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে ব্যথিত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে থাকে।—এই পৃথিবীই কি রূপহীন হয়ে গেল? ভদ্রা কুণ্ডলকেশার নয়ন-মন মুগ্ধ করে দিতে পারে, এমন কোন রূপবান পুরুষ কি এই পৃথিবীতে নেই?

একদিন এইভাবে বাতায়নপথে দাঁড়িয়ে ব্যথিত ভাবনার ভার সহ্য করতে গিয়ে সহসা চমকে ওঠে ভদ্রা। রাজপথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে, রজ্জুবদ্ধ দেহ নিয়ে, প্রহরীর উদ্ধত লগুড়ের ছায়ায় পরিবৃত হয়ে কে চলে যায়? কে এই রূপবান তরুণ? এখনি ছুটে গিয়ে ঐ রূপবানের বক্ষের উপর যে এখনি সমর্পিত হতে চায় ভদ্রা কুণ্ডলকেশার সুন্দরতনুর সকল বাসনা। মুগ্ধ হয় ভদ্রার চক্ষু, ব্যাকুল হয় ভদ্রার হৃদয়।

—পিতা, পিতা!

—বল কন্যা।

—যে রূপবান পুরুষের কণ্ঠে বরমাল্য দান করতে পারি, তার সাক্ষাৎ পেয়েছি।

—কে সে?

—ঐ দেখ।

—অসম্ভব।

—কেন পিতা?

—ও যে দস্যু। অতি নীচ অপরাধের জন্য ধৃত হয়ে প্রহরীর রক্ষণায় চলেছে, ঐ দস্যু যে···।

—কি পিতা?

—প্রহরী ঐ দস্যুকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে চলেছে। রাজ-পুরোহিতের পুত্র, প্রচণ্ড অনাচারী ঐ দস্যুর নাম সথু। দস্যুর বিচার

হয়ে গিয়েছে ; আর কিছুক্ষণ পরে দস্যুর ছিন্নমুণ্ড নদীজলে নিক্ষিপ্ত হবে।

—কিন্তু আমি যে মনে মনে এই তরুণের কাছে আমার হৃদয়ের সব অনুরাগ উৎসর্গ করে দিয়েছি।

—ভুল করেছ কন্যা।

—কোন ভুল করিনি পিতা। আমি এহেন প্রিয়দর্শনেরই প্রিয়া হতে চাই। তুমি আমার নয়ন-মনের প্রিয়, আমার অনুরাগের আস্পদ এই তরুণকে যেকোন উপায়ে রক্ষা কর, উদ্ধার কর, এবং তারই কাছে আমাকে সম্প্রদান কর।

রাজগৃহের রাজকোষের অধ্যক্ষ কন্যার অনুরোধ শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। শঙ্কিত নয়নে হঠাৎ অশ্রুবিন্দু ফুটে ওঠে। এবং পরক্ষণেই রত্ন ও মুদ্রায় পরিপূর্ণ পেটিকা হাতে নিয়ে ছুটে গিয়ে প্রহরীদের উৎকোচ দিলেন। দস্যু সথুকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে ভদ্রার সম্মুখে উপস্থিত করলেন।

তারপর আর বিলম্ব হয় না। দস্যু সথুর নয়নও যেন বিপুল বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। ভদ্রা কুণ্ডলকেশার মুখের দিকে তাকিয়ে নিবিড় প্রীতির স্বরে আহ্বান করে সথু, প্রিয়া ভদ্রা।

বরমাল্য বিনিময় করে ভদ্রা ও সথুর শুভ বিবাহের উৎসবও সমাপ্ত হয়ে যায়।

সথুর অনুরোধ, তাই সথুর সঙ্গে রাজগৃহ নগর হতে অনেক দূরে এক শৈলশৃঙ্গের উপর এসে দাঁড়িয়েছে ভদ্রা। প্রকৃতির সুন্দর শোভা দেখবার ইচ্ছা হয়েছে সথুর। সথুর এই সুন্দর অনুরোধে আরও মুগ্ধ ও ব্যাকুল হয়ে চলে এসেছে ভদ্রা।

সথুরই অনুরোধ, তাই সুন্দর করে সেজেছে ভদ্রা। রত্নখচিত অলঙ্কারের আভায় ভদ্রার বিহ্বল তনু আরও দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। সথু বলেছে, শৈলশৃঙ্গের উপরে দাঁড়িয়ে তোমার রূপের সঙ্গে

শোভাময়ী প্রকৃতির রূপের তুলনা করে বুঝতে চাই ভদ্রা, কে বেশি সুন্দর।

—এই তো আমি, এইবার বল প্রিয় সথু, তোমার প্রিয়া ভদ্রার রূপের চেয়ে কি বেশি সুন্দর এই শোভাময়ী প্রকৃতির রূপ?

অট্টহাসির শব্দ। হেসে উঠেছে সথু—তোমার রূপের জন্য আমার বিন্দুমাত্র লোভ, নেই, কণামাত্র আগ্রহ নেই ভদ্রা। তোমার সমস্ত রত্নালঙ্কার এই মুহূর্তে আমার হস্তে সমর্পণ কর।

—কেন? চমকে ওঠে ভদ্রা।

—তোমার রত্নালঙ্কার নিয়ে আমি এখনি দূরদেশে চলে যাব।

—যদি না দিই? ভ্রুকুটি করে সথুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ভদ্রা।

আবার অট্টহাসি।—তাহলে তোমাকে এইক্ষণে হত্যা করে রত্নালঙ্কার গ্রহণ করবো।

ভদ্রা কুণ্ডলকেশার চোখে যেন হঠাৎ বহ্নির জ্বালা চমকে ওঠে। রূপমুগ্ধ হৃদয়ের সব আশা, সব শান্তি, সব বিশ্বাস আর তৃপ্তি দগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু পরমুহূর্তে হেসে ওঠে ভদ্রা। নিবিড় মায়ায় কণ্ঠস্বর বিগলিত করে আবেদন করে ভদ্রা।—আমার সব রত্নালঙ্কার গ্রহণ কর প্রিয়। কিন্তু রত্নালঙ্কার বর্জন করবার আগে শুধু একবার এই অলঙ্কারে সজ্জিত দেহ নিয়ে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই। আমার এই সামান্য সাধ তৃপ্ত কর প্রিয় সথু।

—তথাস্তু।

প্রিয় সথুর সেই রূপলুব্ধ মূর্তি ভদ্রা কুণ্ডলকেশার আলিঙ্গন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। ব্যাকুলভাবে কাছে এগিয়ে আসে ভদ্রা। ভদ্রার চোখে নিবিড় মায়ায় অভিভূত সেই দৃষ্টি।

কিন্তু অকস্মাৎ বহ্নিময় হয়ে জ্বলে ওঠে সেই দৃষ্টি। ভদ্রার কোমল অধর পাষাণের মত কঠোর হয়ে যায়। এবং দুরন্ত এক

অট্টহাসির শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে, ভদ্রা কুণ্ডলকেশার আলিঙ্গনোদ্যত দুই বাহু পাষাণদণ্ডের মত কঠোর হয়ে সত্থুর সেই প্রসন্ন বক্ষের উপর নির্মম আঘাতের মত লুটিয়ে পড়ে। সত্থুকে শৈলশৃঙ্গ হতে নিম্নের গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করে ভদ্রা।

তারপর আরও তীব্র অট্টহাসির শব্দে নিজেরই বক্ষের রূপলুব্ধ পঞ্জরের ভয়ানক ভ্রান্তিকে যেন ধিক্কার দিতে দিতে শৈলশৃঙ্গ হতে নেমে যায় ভদ্রা।

অধরে দুরন্ত হাসি, এবং চোখে দুরন্ত অশ্রুধারা; উন্মাদিনীর মত পথ ছুটতে ছুটতে প্রান্তরের এক স্থানে এসে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ভদ্রা। দেখতে পায়, অনুচরবর্গ সঙ্গে নিয়ে পিতা কন্যারই সন্ধানে ছুটে আসছেন।

কন্যার জীবনের দুঃসহ ব্যর্থতার কাহিনী শুনলেন পিতা। কিন্তু শুনে সুখী হলেন যে, পাতকী সত্থু ভদ্রারই প্রতিহিংসার আঘাতে বিনাশ লাভ করেছে।

—তবে আর কিসের দুঃখ কন্যা?

—জানি না, কিসের দুঃখ।

—এই দুঃখের অবসান হয়ে যাবে।

—কেমন করে?

—তুমি পুনরায় বিবাহ কর। গুণবান সদাশয়ের ও বিদ্বানের জীবনসঙ্গিনী হও।

—না পিতা, আমাকে বিদায় দাও।

—কোথায় যাবে তুমি?

—ঐ যে, শুনতে পাও না কি পিতা?

—কি?

—ঐ যে দূরের সঙ্ঘারামের বক্ষ হতে প্রার্থনার স্বর বাতাসে ভেসে আসছে।

—শুনেছি কন্যা। কিন্তু ও যে বুদ্ধবাণীর ধ্বনি। এই ধ্বনি শুনে মুগ্ধ হওয়া তোমার পক্ষে উচিত নয় কন্যা।

—এই বাণীই আমার জীবনের সম্বল হবে পিতা।

—কেন ?

—আমি দুঃখের অবসান চাই।

—কন্যা, এই ভয়ানক সঙ্কল্পের লোভ বর্জন কর।

—না পিতা, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চাই।

—কন্যা !

—বাধা দিও না পিতা। আশীর্বাদ কর। আমার জীবনের এই সুখের আকাঙ্ক্ষার যাত্রা যেন সফল হয়।

—সুখের আকাঙ্ক্ষা ?

—হঁ্যা, পিতা। নির্বাণ সুখইএকমাত্র সুখ, সত্য সুখ

—কন্যা। বেদনার্ত স্বরে আবার ডাক দেন পিতা।

কিন্তু ভদ্রা কুণ্ডলকেশা ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে প্রান্তরের সীমারেখার দিকে তাকিয়ে আপন মনের আবেগে বলে ওঠে—ঐ বুঝি গৃধ্রকূট, যেখানে বুদ্ধ ভগবান বিরাজিত আছেন।

—হঁ্যা।

—যাই পিতা, আমি শুনতে পাচ্ছি পিতা, তিনি আমাকে ডাকছেন। এই অসার রূপ-তৃষ্ণা আর মিথ্যা সুখের জগৎ থেকে মুক্তি লাভের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি ডাকছেন। আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম।

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন পিতা। যখন আবার বেদনার্ত হয়ে ভদ্রা কুণ্ডলকেশার মুখ দেখবার জন্য তাকালেন, তখন দেখতে পেলেন, গৃধ্রকূটের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ভদ্রা।

কোন রত্নালংকার নেই, চীর পরিহিতা ভিক্ষুণীর মত পথ হেঁটে চলে যাচ্ছে ভদ্রা।

চতুর্ভুজ ক্লাব

তারকবাবু এসেই বললেন—আপনাদের চেংড়া বয়সের সেই গল্পটা আর একবার বলুন ভবানীবাবু, বসে বসে শুনি।

অর্থাৎ আমাদের ছেলেবেলার সেই চতুর্ভুজ ক্লাবের গল্প। বিনু দীপু নরু আর আমি, মাত্র এই চারজন ছিলাম সেই ক্লাবের মেম্বার। ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ছি, গরমের ছুটি শেষ হয়ে বর্ষা নেমেছে, ঝিলের জল বাঁধ ছাপিয়ে গোর্খা পুলিশের প্যারেডের মাঠে গড়িয়ে পড়েছে। প্যারেড হয় না, গোর্খা পুলিশ মাঠের এক হাঁটু জলের মধ্যে সঙ্গীণ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বড় বড় শোল চেতল আর ফলুইগুলিকে চার্জ করে। সেই সময়।

তারকবাবুকে এর আগে বলেছি এবং আজও বললাম—গল্পটাকে আমাদের চেংড়া বয়সের নিছক একটা গল্প মনে করবেন না মশাই। ওটা যে আসলে মানুষজাতিরই চেংড়া বয়সের গল্প, অন্তত এটুকু আপনার বোঝা উচিত।

তারকবাবু বললেন—বুঝেছি মশাই, খুব বুঝেছি, বুঝিনি আবার! ছেলেবেলার যত ইয়ের দোষ বেমালুম মানুষজাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যদি সারতে চান তো সেরে যান। আমার কোন আপত্তি নেই।

আমি বলি—আরে মশাই, প্রত্যেক ঘটনা বা গল্পের একটা যে সিরিয়াস্ তত্ত্বের দিক আছে, সেটা যদি না বোঝেন তবে……।

তারকবাবু বলেন—তত্ত্বটা বোঝাবেন গৃহিণীকে, যেখানে আসল ভয় সেখানে। আর গল্পটা বলুন আমাকে, একেবারে নির্ভয়ে।

বিনু দীপু নরু এখন কোথায় আছে জানি না। বেঁচে আছে কি না, কে জানে! আমিও তো আজ এসে ঠেকেছি একেবারে ভিন্ন করমের একটা ক্লাবের জীবনে। মাথাভরা পাকা চুল নিয়ে যে ক'জন রোটারিয়ান আছেন, তার মধ্যে আমি একজন এবং তারকবাবুও একজন। তবু তারকবাবুর মত মানুষ, জীবনটা যার এরকম পাক-দশায় পৌঁছে গেছে, তিনিও যখন ঘটনার পাকাটুকু বাদ দিয়ে শুধু কাঁচাটুকু শুনতে চাইছেন, তখন আর উপায় কি?

তাই বলছি।

চতুর্ভুজ ক্লাবের ছোট ইতিহাসের দুটি দিনের ঘটনা আজও বেশ বড় হয়ে মনের মধ্যে রয়েছে। আশ্চর্য, মহাসাগরের বুকে কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া দ্বীপের মত বহুদূর অতীতের একটা ঘটনা, তবু স্মরণ করলেই মনে হয়, এই তো সেদিনের ব্যাপার।

এই তো সেদিন বিনুর বাড়ীতে বাইরের ঘরে মেজের ওপর ঘরজোড়া ধবধবে একটা চাদর পাতা ছিল। তার ওপর বসেছিলাম আমি দীপু আর নরু। আর ছিল গন্ধরাজের একটা মস্ত বড় স্তূপ। রায়সাহেবের মালী আর কুকুরের ভয় তুচ্ছ ক'রে, বাগানের সব গন্ধরাজ প্রায় উজাড় করেই আমরা নিয়ে এসেছিলাম।

হঠাৎ ভেতর ঘরের দিক থেকে একজনকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল বিনু। নিয়ে এসেই তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে আমাদের গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে হেসে উঠলো—এই নে, চতুর্ভুজ ক্লাবের একটা নতুন জিনিস হলো এবার।

জিনিসটা অসহায়ভাবে হুমড়ি খেয়ে আমাদের গায়ের ওপর পড়েই লজ্জায় ছটফট ক'রে উঠলো। মাথার কাপড় নেমে গেল, আঁচলটা কাঁধ থেকে সরে গেল। লতার জালে আটকে-পড়া পাখি যেমন ছাড়া পাওয়ার জন্যে ডানা ফরফর করে, জিনিসটাও তেমনি দু'হাতের ঝাপটা দিয়ে সরে গেল, আঁচল তুলে মুখ ঢাকলো; তারপরেই পালিয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিল।

কিন্তু পারলো না। বিনু দু'হাত তুলে পথরোধ ক'রে ভয় দেখাল —হেই হেই।

ধপ ক'রে বসে পড়লো জিনিসটা এবং গন্ধরাজের স্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

দেখলাম, গন্ধরাজের স্তূপের ওপর একটা মস্ত বড় খোঁপা নিঃশব্দে পড়ে রয়েছে। খোঁপার ওপর একটা সোনালী রঙের টিনের প্রজাপতি। কচি কলা গাছের টুকরোর মত সুগোল ও মসৃণ একটা গলা, তার ওপর মিছরির ছোট ছোট কণিকার মত কাঁচের দানার একটা মালা। বিলিতী আমড়ার মত ফিকে সবুজ রঙের একটা শাড়ি, তার ওপর ভোরের তারার মত দেখতে সাদা ও ছোট ছোট সুতির বুটি। গন্ধরাজের স্তূপটাকে জড়িয়ে ধরে পড়েছিল দুটো হাত, হাতে একটা ক'রে লাল রঙের গালার বালা ও একটা ক'রে সাদা ফুটফুটে শাঁখা। একটা হাতে লোহার তৈরী একটা চুড়িও ছিল।

কি অদ্ভুত! আমরা এসেছি বিনুর বউ দেখতে, কিন্তু বউ দেখতে এসে এরকম একটা অদ্ভুত জিনিস দেখবো, এটা কল্পনাও করতে পারিনি।

কিন্তু বউয়ের মুখই তখনো ভাল করে দেখা হয়নি। বেচারা ভয়ে ও লজ্জায় মুখ লুকিয়ে পড়ে রয়েছে, কে জানে হয়তো কেঁদেই ফেলেছে। বিনুটার বুদ্ধি সুদ্ধি বরাবরই কেমন একটু কর্কশ, পাহাড়ী জমিদারের টাট্টু ঘোড়ার মত। দৌড়য় ভাল, কিন্তু দৌড়ের মধ্যেই ফুর্তির মাথায় চাট ছুঁড়ে এমন এক একটা টাল খায় যে সওয়ারের পিলে চমকে ওঠে। কি দরকার ছিল বউটাকে এরকম ধাকাটাকা দিয়ে একেবারে নাজেহাল ক'রে···।

গন্ধরাজের কাছে এগিয়ে এল বিনু, আর, গালার বালা পরা একটা হাত ধ'রে বললো—টুকু, এই টুকুবৌ, উঠে বসো।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো টুকু-বৌ। দেখলাম টুকু-বৌ হাসছে, কিন্তু চোখ বন্ধ ক'রে রয়েছে।

বিনু বলে—তাকাও। নইলে লোকে মনে করবে কোত্থেকে একটা অন্ধ মেয়ে এসে…।

টুকু-বৌ আবার মুখ নীচু করার চেষ্টা করতেই বিনু টুকু-বৌ-এর ভুরু চিমৃটি দিয়ে ধরলো—তাকাও, ভাল ক'রে তাকিয়ে একবার চতুর্ভুজ ক্লাবকে দেখে নাও।

তাকালো টুকু-বৌ, এবং আমরা ঝটপট এক একটা উপহার টুকুবৌ-এর হাতের কাছে এগিয়ে দিলাম। রঙীন মলাটে বাঁধানো এক একটি বই—মধুসূদন হেমচন্দ্র আর রঙ্গলাল।

উপহার দেখে বিনু হেসে গড়িয়ে পড়ে।—এই সেরেছে! ভাল জিনিস উপহার দিলি!

দীপু প্রশ্ন করে—কেন, কি হলো?

দেখে বুঝলাম, দীপু রাগ করেছে। রাগ করবারই কথা। বিনুর কথাবার্তা বরাবরই একটু রাফ। ফুটবলেও রাফ খেলার জন্য ওর কুখ্যাতি আছে। তবু তার জন্যে বিনুর ওপর সত্যি ক'রে আমাদের রাগ হয়েছে কোন দিন, এ রকম ব্যাপার ঘটেছে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু আজ বেশ রাগ হলো। আমি বললাম—তুই একটা…।

নরু বলে—আজ পর্যন্ত তোর একটা........।

বিনু হেসে হেসে চোখ পাকিয়ে বলে—বড় রাগ করছিস যে, চতুর্ভুজ ক্লাবের নিয়ম মনে নেই?

দীপু—কি?

বিনু—কেউ কারও ওপর রাগ করতে পারবে না।

সবাই হেসে উঠলাম এক সঙ্গে, আমরা চারজন, চতুর্ভুজ ক্লাবের চারজন সদস্য।

কিন্তু প্রশ্নটা মনের মধ্যে রয়েই গেল। উপহারগুলি পছন্দ হলো না কেন বিনুর। রঙীন মলাটে বাঁধানো এক একটি মধুসূদন হেমচন্দ্র আর রঙ্গলাল, এ যদি ভাল জিনিস না হয় তবে…তবে কি হ'লে ভাল জিনিস হতো?

টুকু-বৌ-এর দিকে তাকিয়ে বিনু বললো—যাও, এবার ভাল মানুষটির মত তোমার উপহার নিয়ে এস। ক্ষিধেয় চতুর্ভুজ ক্লাবের পেটে ইঁদুর দৌড়চ্ছে।

পেটের ওপর হাত চাপড়ে বিনু তখনি আবার ব্যস্ত স্বরে তাড়া দেয়—যাও, যাও, খাবার নিয়ে এস। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে কারও ক্ষিদে মিটবে না।

দীপু বিরক্ত হয়ে বলে—আঃ, এত বাজে কথা বলছিস কেন বিনু?

নরু বলে—তুই কি ওকেও হেড পণ্ডিত মনে করেছিস যে, যা মুখে আসে তাই বলে নিচ্ছিস?

আমি বলি—চতুর্ভুজ ক্লাবের নিয়ম তুমিও ভুলে যাচ্ছ বিন্ধ্যেশ্বরবাবু!

বিনু প্রশ্ন করে—কি নিয়ম?

বললাম—সবাই একমত না হ'লে কারও শত্রুতা করতে, নিন্দে করতে বা পেছু লাগতে পারবে না।

আবার হেসে উঠলাম আমরা এক সঙ্গে, চতুর্ভুজ ক্লাবের চার জন সদস্য।

আরও খুশি হয়ে দেখলাম, টুকুবৌ রঙীন মলাটে বাঁধানো তিনটি উপহার এক সঙ্গে হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। খাবার আনতে ভেতর ঘরের দিকে চলে গেল টুকু-বৌ।

চতুর্ভুজ ক্লাবের হাসিখুশিতে কোন বৈষম্য নেই। সবারই সমান শেয়ার। স্কুলেও আমরা ক্লাসের পেছনের বেঞ্চিতে সবাই একসঙ্গে সমান শেয়ার নিয়ে বসি। হেড পণ্ডিতের ধাতুরূপ আর শব্দরূপের প্রশ্নে ব্যাকরণহীন দীপু যদি নিরুত্তর হ'য়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে আমাদেও তাই করতে হবে। উত্তর জানা থাকলেও উত্তর দেবার নিয়ম নেই, হেড পণ্ডিত যতই গর্জন করুন আর গালাগালি দিন না কেন। এ নিয়মের রচয়িতা বিনুই। বিনু বলেছিল—যাই হোক না কেন, যতই বিপদ আপদ আসুক না কেন, ইউনিটি নষ্ট করো না ভাই।

বিনু এমন কথাও মাঝে মাঝে বলে—যদি আমি টেষ্ট-এ গাব্বু মারি, তাহ'লে তোরাও গাব্বু মেরে ইউনিটি রাখতে পারবি তো? বুকে হাত দিয়ে বল্?

আমি বলি—তুই বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্ তো, পড়াশুনায় ইউনিটি রাখবি? মন দিয়ে পড়াশুনার বেলায় যদি আমাদের সঙ্গে ইউনিটি না রাখিস, তবে টেষ্টে পাস করার বেলায় কি ক'রে…।

বিনু বলতো—বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে পারবো না মাইরি। তবে কথা দিচ্ছি, পড়াশুনায় মন দিতে যতদূর সাধ্যি চেষ্টা করবো।

কথা দেবার মাত্র সাতদিন পরেই বিনু বলেছিল—ওরে শুনছিস্?

নরু বলে—কি?

বিনু—চললুম বিয়ে করতে।

দীপু—তার মানে?

বিনু—বউ আনতে।

আমি আশ্চর্য হই—তোর একটুও লজ্জা করছে না বিনু?

বিনু—কেন করবো,? বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই যার, তার আবার লজ্জা কিসের?

সত্যিই কেউ নেই, আপন বলতে কেউ ছিল না বিনুর। যদি কেউ থেকেও থাকে, তবে কোথায় আছে বিনু তা জানে না। বিনুর বাবা দীনবন্ধুবাবুকে অবশ্যি আমরা দেখেছি। গত বছরের আগের পূজোর সময় তিনি মারা গেলেন। ইয়া মস্ত বড় এক জোড়া গোঁফ, মোটা সোটা কালো চেহারার মানুষটি। দাবা খেলায় সুনাম বেশ ছিল, তার চেয়ে বেশি নাম ছিল তবলায়।

বিনুর বাবা চলে যাবার পর রয়ে গেল শুধু বিনু, আর খোলার চাল, কাঁচা ইটের দেয়াল ও মস্ত বড় মাটির উঠোন নিয়ে এই বাড়িটা। আর ছিল সহর থেকে বাইশ মাইল দূরে কিছু জমি, কতখানি কে

জানে, আর খামার। অনেকবার দেখেছি, বাইশ মাইল দূর থেকে মাঝে মাঝে এক একটা ক্লান্ত গরুর-গাড়ির ধুলোমাখা চাকা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক'রে বাজতে বাজতে বিনুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ভাগ-চাষীরা ধান পাঠিয়েছে। শুধু ধান নয়, খড়ও আছে। আছে কয়েক বস্তা মসুরী, কিছু গুড় আর সরষে। ভুট্টাও মন্দ আসে না। মাঝে মাঝে এক একটা কালো পাঁঠা এবং ছোট হাঁড়িতে সামান্য কিছু ঘি। বছরের সারা মাস ধরে এই রকম কিছু না কিছু সামগ্রী বাইশ মাইল দূরের চাষীদের ঘর আর খামার থেকে আসতেই থাকে। এর বেশির ভাগই বেচে দেয় বিনু এবং তাতে টাকা-পয়সা যা আসে, তাইতেই তো বিনুর বেশ চলে যায় দেখছি। ইস্কুলের মাইনেকড়িও নিয়মমত দিয়ে যায়, আর বিড়িটিড়িও খায়।

আমাদের কারও বয়স তখন পনরও পার হয়নি, শুধু বিনু বোধ হয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অন্তত দু'তিন বছরের বড় ছিল। কারণ, যেভাবে বিড়ি টানতো এবং মাঝে মাঝে যে-ভাষায় কথা বলতো বিনু, সেইসব ভাব ও ভাষার বয়স পনর বছর হতেই পারে না। বিনু অবিশ্যি আমাদের সাবধান ক'রে দিত—তোরা এখনি এসব ধোঁয়া টোয়া ধরিসনি রে, আমার সমান বয়স হোক, তারপর।

যেমন বিড়ি খেতে লজ্জা নেই বিনুর, তেমনি বিয়ের কথা বলতেও কোনো লজ্জা হলো না। বিনু বললো—বিয়েকে লজ্জা করার বয়স আমার পার হয়ে গেছে রে দীপু! আমাদের জাতে এই বয়সেই বিয়ে হয়।

হ্যাঁ, শুনেছিলাম, বিনুদের জাতটাও একটু যেন কিরকমের। মুন্সেফ আদালতের ঘরে পেছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঝালর-ওয়ালা পাংখার দড়ি টানে যে বুড়ো, তা'কে মামা বলতো বিনু। ঐ বুড়ো বিনুরই দেশের লোক এবং জাতেরও লোক বোধ হয়।

বিনু বললো—হ্যাঁ, ঐ পাংখা মামাই এই বিয়ের সম্বন্ধটা এনেছে।

অনেকদিন থেকে খোঁজ করছিল পাংখা মামা, এতদিনে একটি জাতের মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে, পুরুলিয়ার কাছে কোন্ এক গাঁয়ে।

ঐ মেয়েকেই বিয়ে ক'রে ফিরে এসেছে বিনু। আমরা এসেছি বিনুর বউ দেখতে। দেখা হয়েছে। এখন বসে আছি হাঁ ক'রে, আর একবার দেখবার আশায়।

না, ঠিক তা নয়। খাবার খাওয়ার আশা নিয়েই বসে আছি। খাবার আনতে গেছে টুকু বউ।

নরু বলে—উপহারগুলো তোর বুঝি পছন্দ হলো না বিনু ?

দীপু বলে—বিনুর পছন্দ হলো না তো বয়ে গেল। যা'কে উপহার দেওয়া হয়েছে সে যদি পছন্দ করে তো, বাস্।

আমি বলি—পছন্দ তো করেইছে, দেখতেই তো পেলুম।

বিনু—কি দেখতে পেলি ?

আমি—কত আগ্রহ ক'রে আর কেমন যত্ন ক'রে বইগুলি নিয়ে গেল টুকু বউ…কি যেন বলতে হয়…টুকু বৌদি।

বিনু—তিনটি বই জোড়া দিয়ে মাথার বালিশ করবে তোর টুকু বৌদি।

আমরা একটু আশ্চর্য হ'লাম এবং মনে হলো, এইবার বিনুর হাসি ও ইয়ার্কির অর্থটাও বুঝতে পারছি।

দীপু লজ্জিতভাবে প্রশ্ন করে—কেন রে ? টুকু বউ বুঝি কিচ্ছু…

বিনু—কিচ্ছু না ক অক্ষরও চেনে না। আস্ত আকাট।

শুনে একটু দুঃখই হলো। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, একটুও লেখাপড়া শিখলো না কেন টুকু বউ ?

বিনু—কেন শিখবে ? কিসের ভয়ে ? যার বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, তার আবার ভয় কিসের ?

নরু—কি বলছিস তুই ? টুকু বউয়ের কেউ নেই ?

বিনু—কেউ নেই। আরে তা না হ'লে কি আমার মত লোকের সঙ্গে বিয়ে হয় ?

শুনে মনটা আরও কেমন যেন হয়ে গেল। দীপু আর নরুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ওরাও মনমরার মত তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। কেউ আর কোন কথা বলছে না দেখে আমিই শেষে আমতা আমতা ক'রে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম—তা হ'লে?

জানতে ইচ্ছে করছিল, তাহলে কোথায় পেল, কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল বিনু, গন্ধরাজের রাণীর মত এই রকম একটা মেয়েকে? কেমন ক'রে এতদিন বেঁচেছিল টুকু বউ? কেউ নেই টুকু বউ-এর, তবে কি মানুষের বিনা আদরেই বড় হয়ে উঠলো এরকম একটা আদরের মানুষ? রাগ করলে কি কেউ ওকে সেধে সেধে খাওয়ায়নি? বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেখে ঘরে যখন ফিরে এসেছে, কে তখন টুকু বউয়ের থুতনি ছুঁয়ে কপালের ওপর একটি···।

কে জানে, কেমন করে এতদিন ধরে বেঁচে রইল টুকু বউ!

বিনু একটা বিড়ি ধরায়, আর গাল ফুলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে নিয়ে বলে—ঐ, কি সম্পর্কে যেন পিসি হয়, তাদেরই কাছে এতদিন ছিল। বড় কষ্ট দিত পিসি। শীতের রাতেও মাটিতে শুয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে, একটা কাঁথাও পায়নি টুকু বউ।

দীপুর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে, যেন ভয় পেয়েছে। এবং নরু চেঁচিয়ে ওঠে—কে? কার কথা বলছিস?

বিনু—টুকু বৌ-এর কথা বলছি। কি অবস্থায় ছিল, তার সব খবর যদি শুনিস তো একেবারে কাদা হয়ে যাবি।

আমি বললাম—খেতে টেতে দিত তো?

বিনু ধমক দেয়—রাখ ওসব কথা, ও সব তোদের শোনবার দরকার কি?

দীপু বিরক্ত হয়ে পাল্টা ধমক দেয়—এখন ইউনিটি নষ্ট করছে কে, শুনি?

বিনু হাসে—কে?

দীপু—শুধু তুমিই সব জানবে, আর আমরা জানবো না, চতুর্ভুজ ক্লাবের এটা নিয়ম নয়।

হো হো ক'রে হেসে উঠলাম সবাই এক সঙ্গে, চতুর্ভুজ ক্লাবের চারজন মেম্বার।

বিনু বলে—সত্যিই, শুনে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সবার পাতের এঁটো ভাত জমা ক'রে রাখতো পিসি, আর টুকু বেচারা তাই খেত।

নরু—পিসি রাস্কেলটার সঙ্গে কথা বলেছিস্ তুই?

বিনু—না বলে উপায় আছে? তবু থ্যাঙ্কস্ পিসিকে, আমাকে আমাকে আর এঁটো ভাত খাওয়ায়নি। বরং নিজের হাতে দই মুড়কি নিয়ে এসে খাইয়েছে আমাকে।

দীপু—ঝাঁটা মেরেছে তোকে।

বিনু বলে—মারতো ঠিকই, কিন্তু ভাগ্যিস্……।

কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল বিনু। আমিও বিরক্ত হয়ে বলি—তুই হঠাৎ এ রকম ক'রে কথা চেপে দিচ্ছিস কেন বল্‌তো?

বিনু—তাহ'লে বলেই ফেলি, যাঃ। বিয়ের সব খরচ পিসি আমার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছে!

নরু—কত খরচ হলো?

বিনু—ত্ব'শো টাকার ওপর।

দীপু—এত টাকা কোথায় পেলি তুই?

বিনু—গুড় বেচে যা পেয়েছিলাম সব দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তাতেও কুলোয়নি। উঠোনে দাঁড়িয়ে বুড়ির সে কি চিৎকার! ঠগ জোচ্চোর, যা মুখে এল সবই বললে পিসি। তখুনি বেরিয়ে স্যাক্‌রা বাড়িতে গিয়ে আংটিটা বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে এলাম। পিসির পাওনা বাকি সাড়ে ছাব্বিশ টাকা নগদ নগদ মিটিয়ে দিলাম।

দীপু ভ্রুকুটি ক'রে বলে—এতগুলি টাকা দিয়ে ফেল্‌লি তুই? ঐরকম একটা পিসির ভয়ে? শেম্!

বিনু—রেখে দে তোর শেম্। টুকুকে ঘরে পুরে দরজায় তালা লাগিয়ে আট্‌কে রেখেছিল, জানিস্? টাকা দিয়ে পিসিকে খুশি না করলে কোত্থেকে আস্‌তো ঐরকম একটি জিনিষ চতুর্ভুজ ক্লাবের ঘরে?

মুখভরা হাসি, একটা চোখ আহ্লাদে নিভু নিভু, ভুরু নাচিয়ে বিনু আমাদের ইসারা ক'রে দরজার দিকে তাকাতে বলে—ঐ যে এসে গেছে।

দরজার দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, চতুর্ভুজ ক্লাবের ঘরে সেই নতুন আবির্ভাব আস্তে আস্তে আর হাসতে হাসতে আস্‌ছে। হাতে একটা মস্ত বড় থালা, তার ওপর রসবড়ার একটা স্তূপ।

এতদিনে সত্যিই মিষ্টি হয়ে উঠলো চতুর্ভুজ ক্লাবের বাতাস। ভাগ্যিস্ বিনুটার লজ্জা টজ্জা নেই, তা না হলে পাংখা মামার ঠেলায় পড়েও হয়তো বিয়ে করতে যেত না। ভাগ্যিস্ বিনু কিপ্‌টেমি করেনি, পিসি যত টাকা চেয়েছে, সব দিয়ে দিয়েছে। খুব ত্যাগ স্বীকার করেছে বিনু, চতুর্ভুজ ক্লাবের সব আনন্দ এভাবে মিষ্টি করে তোলবার জন্যই তো হাসিমুখে ফতুর হয়েছে আর পিসির গালাগালি সহ্য করেছে বিনু।

বরাবরই দেখেছি, চতুর্ভুজ ক্লাবের ওপর বড্ড দরদ আর ভালবাসা আছে বিনুর। ফুটবলে অন্য সবারই সঙ্গে যতই রাফ খেলা আর সেল্‌ফিশ খেলা খেলুক না বিনু, আমাদের চারজনকে বল পাস দিয়েই খেলে।

চতুর্ভুজ ক্লাবের সম্পত্তি বলতে তিনটে জিনিষ ছিল। আমার একটা গ্রামোফোন, দীপুর একটা সাইকেল আর নরুর একটা ক্যামেরা। বিনুর বাড়িতে, অর্থাৎ আমাদের চতুর্ভুজ ক্লাবের সদরে এই জিনিষগুলি সদাসর্বদা পড়ে থাকতো! যার যেমন খুশি এবং যখনই প্রয়োজন তখনই ব্যবহার করতে কোন বাধা ছিল না। সেদিনও বাইরের ঘরে গন্ধরাজের পাশে ব'সে দেখছিলাম, ভেতর ঘরে একটা চৌকির ওপর পড়ে রয়েছে গ্রামোফোন আর ক্যামেরাটা এবং

সাইকেলটা দাঁড়িয়ে আছে খোঁড়ার মত হেলান দিয়ে দেয়ালের গায়ে। ক্লাবের জিনিষ, সুতরাং জিনিষগুলিকে অযত্ন করবার সমান অধিকার সবারই ছিল। তবুও জিনিষগুলি তখনো টিঁকে ছিল। তখনো সাইকেলটার চাকা চলে, গ্রামোফোনের গলা গান করে এবং ক্যামেরার চোখ অন্ধ হয়ে যায়নি। এতদিন ধরে এই জিনিসগুলিই তো আমাদের ক্লাবের ইচ্ছা আর আনন্দগুলিকে দিগ্বিদিকে ছুটতে, সুরের হুল্লোড় করতে, আর বন পাহাড় ও ঝিলের যত দৃশ্য ধরে আনতে সাহায্য করেছে।

এবার এসেছে টুকু-বউ। চতুর্ভুজ ক্লাবের নতুন সম্পদ। ঠিক গ্রামোফোন সাইকেল আর ক্যামেরার মত জিনিস অবিশ্যি নয়, কিন্তু প্রাণের মতন জিনিস তো বটে। রসবড়ার থালা গন্ধরাজের পাশে রেখে দিয়ে কোমরে আঁচল জড়াচ্ছিল টুকু-বৌ। চতুর্ভুজ ক্লাবের কর্কশ হুল্লোড়ের মধ্যে হঠাৎ যেন কোথা থেকে একটি রূপকথার মিষ্টিহাসির মেয়েএসে পৌঁছে গেছে। এই মিষ্টিহাসিকে কোন্ এক ভুতুড়ে উপকথার ভয়ংকরী পিসি ঘরের অন্ধকারে তালাবন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু সে ভয় আর নেই। টুকু বৌ এখন আর কারও ভয়ের দাসী নয়। টুকু-বউ এখন শুধু আমাদের চতুর্ভুজ ক্লাবের টুকু-বউ।

বিনু তার আস্তিন গুটিয়ে রসবড়ার থালার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাক দেয়—এগিয়ে আয় সবাই, হাত চালিয়ে সাবাড় কর।

টুকু-বউ রসবড়ার থালাকে দু'হাত দিয়ে আল্‌গোছে আটক করে ধরে। বাধা দিয়ে বলে—না, থাবাথাবি ক'রে অনাছিষ্টি করতে দেব না। হাত পাত সবাই, আমি ভাগ করে দিচ্ছি।

কথা বললো টুকু-বউ, এবং বলামাত্র চতুর্ভুজ ক্লাবের এতক্ষণের সঙ্কোচ আর ধৈর্যের প্রাচীর যেন তোপের মুখে ধূলো হয়ে উড়ে গেল। চতুর্ভুজ ক্লাবের এতক্ষণের বুড়োমানুষী মুখোস চূর্ণ হয়ে বেরিয়ে পড়লো আসল আত্মাটা। একসঙ্গে চারজনেই লাফ দিয়ে উঠে টুকু-বৌয়ের সামনে গিয়ে হাত পাতে। গুণে গুণে দুটো এবং কখনো বা তিনটে

করে রসবড়া সবারই হাতে দেয় টুকু-বৌ। হিসেবে ভুল করে না টুকু-বৌ, যদিও হিসেব করতে বেশ সময় নেয়। হিসেব ভুল করিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করে দীপু—আমি পাইনি, আমার একটা কম হয়ে গেল টুকু-বৌ।

টুকু-বৌ কিছুক্ষণ দীপুর মুখের দিকে তাকায়। যেন মনে মনে একটা হিসাব করে; তার পরেই বেশ গম্ভীরভাবে বলে—না, ঠিক দিয়েছি, মিথ্যে কথা বলো না।

দীপু তৎক্ষণাৎ নরুকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর চড়ে বসে এবং নরুর হাত থেকে একটা রসবড়া কেড়ে নিয়ে খেতে থাকে।

বিনু চীৎকার করে, আমি হাসি। নরু এক ধাক্কায় দীপুকে উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, টুকু-বৌ-এর কাছে গিয়ে হাত পাতে—আমাকে একটা বেশি দিতে হবে।

টুকু-বউ বিরক্ত হয়—আঃ, এরকম করে হিসেব গোলমাল করে দিও না ভাই।

বিনু হাত পাতে—আমার একটা দানই বাদ পড়ে গেছে। হিসেব করছো না কচু করছো।

টুকু-বউ বিস্মিত হয়—কখন্ বাদ পড়্লো ?

বিনু—শেষ দানটা আমি পাইনি।

ভ্রূকুটি করতে গিয়ে হেসে ফেলে টুকু-বউ, আর বিনুর হাত ঠেলে সরিয়ে দেয়—জোচ্চুরি করবার জায়গা পাওনি ?

থালা যখন শূন্য হলো তখন আমি চেঁচিয়ে উঠি—এ কি, তোমার জন্যে রাখ্লে না টুকু-বউ ?

টুকু-বউ হাসে—উঃ, কি দয়ার মানুষ! এতক্ষণে চোখে পড়েছে···।

কথা শেষ না করেই টুকু-বৌ শূন্য থালা হাতে নিয়ে ভেতর ঘরে চলে গেল এবং তখুনি ফিরে এল, একটা জলের কুঁজো আর গেলাস নিয়ে।

জলের গেলাসের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সকলে একসঙ্গে দু'হাত আঁজলা করে টুকু-বৌয়ের সামনে দাঁড়ালাম। নরু মাথা নেড়ে ইসারায় বিনুকে কি যেন বললো।

জল ঢালবার জন্যে কুঁজো তোলে টুকু-বৌ, কিন্তু ঢালে না। সবার মুখের দিকে চকিতে তাকিয়ে নিয়ে একটু সাবধান হয়ে দাঁড়ায়।

টুকু-বউ বলে—মতলব তো ভালো মনে হচ্ছে না! জলটল আমার গায়ে ছিটিয়েছ কি আমিও তোমাদের মাথায় কুঁজো উপুড় করে দেব। সাবধান!

এক লাফে পিছিয়ে আসে সবাই। নরু ও বিনুর মতলব ফেঁসে যায়। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকের মতই জল খেলাম আমরা।

ভেবেছিলাম, বিনুর বউ দেখেই আমরা বাড়ি চলে যাব। দেখাও হয়ে গেল, কিন্তু বাড়ি যেতে দেরি হলো অনেক।

টুকু-বউ বললো—খিচুড়ি রাঁধছি, না খেয়ে কেউ বাড়ি যেতে পাবে না।

যতক্ষণ খিচুড়ি রাঁধলো টুকু-বউ ততক্ষণ আমরাও চুপ করে বসে না থেকে অনেক কাজ করলাম। চতুর্ভুজ ক্লাবের কাজ।

আমি গ্রামোফোনটাকে হাতের কাছে টেনে নিয়ে মেরামত করতে বসলাম। ভাল ভাল কয়েকটা ভজন শোনাতে হবে টুকু বউকে।

নরু তার ক্যামেরাটার চোখ-মুখ খুলে পরীক্ষা করতে থাকে। দীপু জিজ্ঞাসা করে—ক্যামেরার ওপর হঠাৎ এত যত্ন কেন নরু? মতলব কি?

নরু বলে—টুকু-বউ-এর একটা ফটো তুলবো।

দীপু কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে; তারপরেই তার লক্কড় সাইকেলটাকে মেজের ওপর পাট করে ফেলে ঘষা-মোছা শুরু করে দেয়।

আমি আর নরু প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করি—সাইকেলটাকে এত যত্ন করছিস কেন দীপু?

দীপু আমাদের দিকে তাকিয়েই রেগে ওঠে—টুকু-বৌকে সাইকেল চড়া শেখাবো।

বিনু এসে বলে—আমি কি করি বল্ দেখি? আমাকে তো রান্নাঘর থেকে দূর দূর করে ভাগিয়ে দিলে।

আমি বলি—তুই আপাতত দীপুকে একটু ঠাণ্ডা কর বিনু।

বিনু—দীপু গরম হলো কেন?

নরু—টুকু বউকে সাইকেল চড়া শেখাতে চায় দীপু।

বিনু উৎসাহিত হয়ে হাসে—তা মন্দ বল্সিনি দীপু। যে রকম স্মার্ট মেয়ে, দু'দিনেই নির্ঘাৎ শিখে ফেল্‌বে।

দীপু উল্লসিত হয়ে বলে—তা ছাড়া, কত বড় উঠোন, আর কত জায়গা। সাইকেল শিখতে কোন অসুবিধেই নেই এখানে।

যতক্ষণ না টুকু-বউ-এর খিচুড়ি রাঁধা শেষ হলো, ততক্ষণ কাজ করলাম আমরা।

তারপর রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর একটা পেতলের গামলাকে ঘিরে চারজনে একসঙ্গে বসলাম। গামলাভরা খিচুড়ি শেষ করলাম। টুকু বউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো।

তারপর খেতে বস্‌লো টুকু-বউ। আমরা টুকু-বউয়ের সামনে বসে খাওয়া দেখলাম, আর যত খুশি হৈ-চৈ করলাম—চেঁচিয়ে, ছটফট করে, শিস দিয়ে, গান গেয়ে, গল্প করে, পাঞ্জা লড়ে, হরবোলা শুনিয়ে, ধাক্কাধাক্কি আর ঠেলাঠেলি করে।

খাওয়া শেষ হয় টুকু-বউএর, এইবার বাড়ি যাবার জন্য মনটাকে তৈরী করবার চেষ্টা করি আমরা। এখানে আর কত দেরি করবো? স্কুল কামাই তো হলো, তার ওপর যদি সন্ধ্যেবেলা টিউটর এসে ফিরে যান, তাহ'লে সেজকাকার সেই বিশ্রী মুখ ভেংচানি থেকে কি আর রক্ষে আছে?

টুকু-বউ বলে— কি হবে বাড়ি গিয়ে? বসো, কোথাও যেতে হবে না।

আমি বলি—পড়াশোনা আছে টুকু-বউ।

বিনু বলে—আরে রাখ্ তোর পড়াশোনা। আজকের দিনটাও যদি একটু নষ্ট না করিস্ তবে…।

ঠিকই বলেছে বিনু। আজকের দিনটাকে, চতুর্ভুজ ক্লাবের মনের আকাশে এমন একটা রামধনু আঁকা রঙীন দিনটাকে হেসেখেলে নষ্ট করতেই তো ইচ্ছে করছে।

নরু একটু দ্বিধা ক'রে বলে—শুধু চুপ করে বসে থেকে লাভ কি?

টুকু-বউ হেসে ওঠে—তবে চেঁচাও আর লাফাও।

বিনু বলে—আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

সবাই বিনুর মাথার দিকে কৌতুহলী হয়ে তাকাই।

বিনু টুকু-বউ-এর দিকে তাকিয়ে বলে—তোমাকে জ্বালিয়ে আর জব্দ করে আজকের দিনটা নষ্ট করবো টুকু বউ। বল, রাজি আছ?

টুকু-বউ বলে—খুব রাজি। দেখি কার সাধ্যি আমাকে জব্দ করে?

টুকু-বউকে উঠোনের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হলো। গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হলো। বিনু বললো—এইবার শোন আমাদের কানা গুড়্‌গুড়্, এক একটা চিমটির জ্বালা বুঝে বলে দিতে হবে, কার চিম্‌টি। যতক্ষণ না ঠিক ঠিক বলতে পারবে, ততক্ষণ উদ্ধার নেই। যার চিমটি ধরা পড়বে, তাকেই আবার কানা গুড়্‌গুড়্ হতে হবে।

বিকেলের সূর্য তখন আর দেখা যাচ্ছিল না, কারণ বিনুদের উঠোনের পশ্চিম জুড়ে রায় সাহেবের তিনতলা বাড়িটা সটান দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া পড়েছে উঠোনে। উঠোনের এক পাশে খড়ের মাচানের উপর এসে বসেছে চড়াই আর কাকের দল, এক একটা খড়ের কুটো মুখে তুলে নিয়েই উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে!

প্রথমেই বিনু নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগিয়ে টুকু-বউয়ের পিঠে একটা চিমটি কেটে সরে এল। টুকু বৌ বলে—ভবানী ঠাকুরপো।

ভুল। সবাই একসঙ্গে হেসে জানিয়ে দিলাম, ভুল হয়েছে টুকু-বউ-এর।

টুকু-বৌয়ের হাতের উপর আমি একটা চিমটি দিয়ে সরে গেলাম। টুকু-বৌ চেঁচিয়ে ওঠে—দীপু ঠাকুরপো।

ভুল হয়েছে আবার। এইবার দীপু আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে টুকু-বৌয়ের পায়ের পাতায় চিমটি কেটে পালিয়ে আসে। টুকু-বৌ পায়ের পাতা হাত দিয়ে চেপে বলে—উঃ, এটা নিশ্চয়ই নরু ঠাকুরপো।

ভুল, ভুল, হলো না! টুকু-বৌয়ের সব অনুমান ভুল হয়ে যাচ্ছে। এর পর নরু চিমটি কাটলো টুকু-বৌয়ের ঠিক ঘাড়ের ওপর। চেঁচিয়ে ওঠে টুকু-বৌ—এটা, এটা হলো·· তোমাদের বন্ধুটি।

একেবারে ভুল। আমরা হেসে উঠতেই টুকু-বৌ ফস্ করে চোখের গামছা এক টানে নামিয়ে দিয়ে বলে—একটুও ভুল হয়নি। হিসেব করে দেখ, আমার কোন ভুল হয়নি।

জিজ্ঞেসা করি—হিসেব আবার কি?

টুকু-বৌ—হিসেব করে বলো, তোমরা চারজনেই একটা ক'রে চিমটি কেটেছ কি না।

বিনু বলে—হ্যাঁ, তা তো কেটেছি। কিন্তু তাতে কি হলো?

টুকু বৌ—আমিও চারজনের নাম বলেছি। কেউ দু'বার কেটেছে, আর কেউ একবারও কাটেনি, এমন তো হয়নি। আমিও তো দু'বার কারও নাম করিনি।

ওরে বাবা! কি চালাক মেয়ে, আর কি ভয়ংকর হিসেব করার বুদ্ধি! আমরা যত হাসছিলাম আর চেঁচাচ্ছিলাম, আশ্চর্য হচ্ছিলাম তার চেয়ে বেশি। টুকু-বৌ কি একদিনের মধ্যেই আমাদের চতুর্ভুজ ক্লাবের মন আর মনের নিয়মগুলি বুঝে ফেলেছে? হেড পণ্ডিতের গালাগালি আর পিকনিকের খিচুড়ি আমরা সমান শেয়ারে খেয়ে থাকি। টুকু-বৌকে চিমটি কেটে জ্বালাবার আনন্দও আমরা সমান

শেয়ারে ভাগ ক'রে নিয়েছি, এটাও ধরে ফেলেছে টুকু-বৌ। আশ্চর্য, এ তো সত্যি কানা গুড়গুড় নয়।

বিনু আবার টুকু-বৌয়ের চোখ বাঁধতে যাচ্ছিল। টুকু-বৌ এক লাফে সরে গিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই আমরা তিন দিক থেকে ঘিরে ধরলাম। চেঁচিয়ে উঠলো টুকু-বৌ—ডাকাত! ডাকাত!

মাথার ওপর অনেক উঁচুতে আকাশের দিক থেকে ঘড়াং করে একটা শব্দ বেজে উঠলো।

রায় সাহেবের বাড়ির দোতলার জানালা ঘড়াং করে খুলে গেছে, আর উঁকি দিয়েছে এক জোড়া গোল-গোল চোখ, আর এক জোড়া ড্যাবা ড্যাবা চোখ।

এই দু'জোড়া চোখ প্রায়ই ক্লাবের হুল্লোড় আর হুটোপুটি আনন্দগুলির দিকে ক্ষুব্ধভাবে কটমট ক'রে তাকিয়ে থাকে, যদিও আমরা ঐ চোখ আর চোখের কটমটানিকে কোনদিন একটুও পরোয়া করিনি, করিও না।

গোল গোল চোখ দুটো হলো রায়সাহেবের মেয়ের। ইয়া মোটা চেহারা। দু'পায়ে বাত। সব সময় মোজা পরে থাকেন। আমরা নাম দিয়েছি বাতুলদি।

আর ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো হলো রায়সাহেবের শালির। শুকনো ঝিরকুট দেখতে, হাতে সব সময় একটা না একটা কাপড়ের টুকরো আর একটা সূঁচ। আমরা নাম দিয়েছি, বিসূচিকা মাসি!

বাতুলদির গলায় আওয়াজ শুনতে পেলাম—কি হয়েছে মাসিমা? ব্যাপার কি?

বিসূচিকা মাসি গলা ঘড়্ ঘড়্ ক'রে বলেন—চারটে বাঁদর আর একটা বাঁদরী!

আবার ঘড়াং করে সশব্দে দোতালার জানালা বন্ধ হয়ে গেল।

খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে টুকু-বৌ। তারপরেই মুখের ওপর

আঁচল চাপা দিয়ে বলে—এবার তোমরা চারটে মানুষ একটু জিরিয়ে নিয়ে সরবৎ খাও, কেমন ? আমি এখুনি তৈরি করে দিচ্ছি।

যখন সন্ধ্যে সত্যিই হয়ে গেল এবং টুকু-বৌ আলো জ্বাললো, তখন আমরা বিদায় নিলাম।

টুকু-বৌ বলে—পড়াশোনা যতই থাক্, রোজ একবার আসা চাই কিন্তু। আমরা বললাম—নিশ্চয়।

চতুর্ভূজ ক্লাবের জীবন চলছিল বেশ ! স্কুলের ছুটির পর রোজই বিকেলে বিনুর বাড়িতে আমরা না এসে থাকতে পারতাম না। গ্রামোফোন সাইকেল আর ক্যামেরা মেরামত করে ফেলেছি। অনেক ভজন শুনেছে টুকু-বৌ। প্রায় সাত-আটটা ফটো তোলা হয়েছে টুকু-বৌয়ের, এবং সাইকেল শিখতে গিয়ে দু'বার আছাড় খেয়েছে টুকু-বৌ।

সেদিন একটা ছুটির দিন ছিল, এবং বৃষ্টিও ছিল না। টুকু-বৌকে নিয়ে আমরা বের হলাম দুপুর বেলা এবং সহর থেকে তিন মাইল দূরে একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা চারজন, আমাদের মাঝখানে টুকু-বৌ। নীচে শালবনের সবুজ ঢেউ, রোদে ঝলমল সীমাহীন ধানক্ষেত আর লাল-কাঁকরের মাঠ, তার মাঝে মাঝে জংলী নদী নালা আর ঝিল, গলানো রূপোর মত জল চিক্ চিক্ করছে। টুকু-বৌ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আর আমাদের মনে হচ্ছিল, টুকু-বৌকে নিয়ে আমরা চারজন যেন পৃথিবী থেকে পালিয়ে একটা নীল আকাশের দেশে এসে পড়েছি।

পাহাড় থেকে নেমে, ঝিলটাকে দু'বার চক্কর দিয়ে ঘুরে, মাঠের ঘাস থেকে মখমল পোকা কুড়িয়ে এবং এক গাদা বুনো ঝুমকো আর টিয়ের পালক কুড়িয়ে নিয়ে যখন চতুর্ভুজ ক্লাবের উঠোনে এসে পৌঁছলাম, তখন

সন্ধ্যে গভীর হয়ে গেছে। উঠোনের ওপর খড় বিছিয়ে একেবারে গড়িয়ে পড়লাম আমরা। খুব ক্লান্ত হয়েছিলাম।

চাঁদ উঠেছিল পূর্বদিকে, তাই রায়সাহেবের বাড়ির দেয়াল আমাদের উঠোনের জ্যোৎস্না বন্ধ করতে পারলো না। টুকু-বৌ বলে—এখন আমার কি ইচ্ছে করছে বলবো?

বললাম—বলো।

টুকু-বৌ—ইচ্ছে করছে এখন চারজনের কাঁধে চেপে শ্মশানে চলে যাই। তোমরা চারজনে মিলে আমাকে ছাই করে দিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে ফিরে আসবে, বাস্। এর চেয়ে বেশি সুখ চাই না।

শুনে বুক কেঁপে উঠলো। টুকু-বৌ যেন আজকের উঠোনের এই জ্যোৎস্নার মধ্যেই তার সুখের শেষ দেখতে পেয়েছে। যেন এর পরই কালো-ছায়া নেমে আসবে। এবং সেই ছায়ার ভয়ে আগে ভাগেই··· কি যে বলতে চাইছে টুকু-বউ, কিছুই বুঝতে পারছি না।

রাগ হলো টুকু-বৌয়ের ওপর। আমি দীপু আর নরু তিনজনেই আচ্ছা করে বকুনি দিলাম টুকু-বৌকে—ফের যদি এরকম কথা বলেছ তো ভাল হবে না।

শুধু কোন কথা বললো না বিনু।

চতুর্ভুজ ক্লাব থেকে সে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় মনে একটা খট্‌কা নিয়ে ফিরে এলাম। এরকম কোনদিনই হয়নি।

পরের দিনই চতুর্ভুজ ক্লাবের বৈঠকে মনের খটকা আর একবার খট্ করে মনের ভেতর বেজে উঠলো।

বিনুর বাড়ির বাইরের ঘরে বসে গ্রামোফোন বাজাচ্ছিলাম আমরা চারজন। বিনু বেশ ফুর্তি করেই মাথা দুলিয়ে মিষ্টি মিষ্টি সুরেলা ভজনগুলিকে দোলাচ্ছিল। টুকু-বৌ এল একটা থালায় কুমড়ো ফুলের বড়া নিয়ে। গান শুনতে বসলো টুকু-বৌ।

কুমড়ো ফুলের বড়ার ওপর চিলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের

এক একটা হাত। আমার, দীপুর আর নরুর হাত। শুধু হাত গুটিয়ে বসে রইল বিনু।

টুকু-বৌ একটু গম্ভীরভাবে বিনুর দিকে তাকায়—তোমার হাতে কি হলো?

বিনু—এরকম বড়া খেতে আমার লোভ হচ্ছে না। আমার জন্যে মচমচ করে কয়েকটা বড়া ভেজে এনে দাও।

টুকু-বৌ থালাটাকেই ধরে টান দেয়—বেশ; সবই মচমচ করে ভেজে আনছি।

থালা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলেই যাচ্ছিল টুকু-বৌ। বিনুর চোখের তারা যেন ধক্ করে জ্বলে উঠলো মনে হলো।—শোন!

টুকু-বৌ মুখ ফিরিয়ে তাকায়—বলো

বিনু বলে - একটা প্লেটে গোটা চারেক বড়া ভিন্ন করে, আর তার সঙ্গে কিছু আদা কুচিয়ে আনবে।

টুকু বৌ—কার জন্যে?

বিনু—আমার জন্যে, ঐ থালাটালা আমার ভাল লাগে না।

টুকু-বৌ চোখ দুটোকে কেমন যেন শুকনো খট্‌খটে আর শক্ত করে নিয়ে তাকায়—বেশ তো, একটা প্লেটে কেন, চারটে প্লেটেই ভিন্ন ভিন্ন করে তোমাদের জন্যে মচমচে বড়া এনে দিচ্ছি। তাহলেই তো হলো!

আমি বললাম—আমাদের ঐ এক থালাতেই হয়ে যাবে টুকু-বৌ, প্লেট আনতে হবে না।

দীপু বলে—আর মচমচে করতেও হবে না, এতেই হবে।

নরু বলে—আদা-টাদার কোন দরকার নেই।

টুকু-বৌ আবার থালা নামায়। আমরা তিনজন একসঙ্গে সমানে হাতে চালিয়ে বড়া খাই। শুধু বিনু আমাদের এই কুমড়ো ফুলের বড়ার উৎসব থেকে একটু আলগা হয়ে আর ভিন্ন হয়ে বসে থাকে এবং হেসে হেসে বিড়ি টানতে থাকে।

কিন্তু এ'তো ঠিক চতুর্ভুজ ক্লাবের মনের নিয়মমত উৎসব হচ্ছে না।

চারজনের মধ্যে একজন যে আল্‌গা হয়ে আর ভিন্ন হয়ে দূরে সরে রয়েছে। আর কেউ নয়, বিনু, যে বিনু চতুর্ভুজ ক্লাবের ইউনিটির জন্যে কি না করেছে। কি হয়েছে বিনুর? আমাদের সঙ্গে বসেও নিজেকে এরকম একটা স্পেশ্যাল করে তুলতে চাইছে কেন বিনু?

হল্লোড় করে কুমড়ো ফুলের বড়া খাচ্ছি। মীরার ভজনও গলা ছেড়ে বাজছে। তবু মনে হলো, চতুর্ভুজ ক্লাবের আত্মাটা যেন হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে উঠেছে ভেতরে ভেতরে, বাইরে থেকে যদিও কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

দুঃখ হচ্ছিল বিনুর জন্য। এভাবে ভিন্ন হয়ে থেকে কি সুখ পাচ্ছে বিনু? কিসের স্বপ্ন ওকে এভাবে আমাদের কাছ থেকে আল্‌গা করে দিচ্ছে? বুঝতে পারি না কিছুই।

কিন্তু টুকু বউকে খুব ভাল করেই বুঝতে পারছি। বিনু যেমন অযথা একটা আঘাত দিয়ে চতুর্ভুজ ক্লাবকে মনমরা করে দিয়েছে, টুকু-বউ তেমনি যেন দুহাতে শক্ত ক'রে চতুর্ভুজ ক্লাবের মনটাকে জড়িয়ে ধরেছে আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য।

টুকু-বৌয়ের চোখের আর মনের হিসেব দেখে এর আগে অনেকবার আশ্চর্য হয়েছিলাম। আজও আবার আশ্চর্য হলাম। আজ টুকু-বৌ আমাদের সঙ্গে বসে এক থালাতেই হাত চালিয়ে কুমড়ো ফুলের বড়া খেল। এই প্রথম। যেন আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের মুখঢাকা দুঃখ আর ভয়গুলিকে দেখতে পেয়েছে টুকু-বউ। যেন হিসেব করে বুঝে ফেলেছে টুকু-বউ, একজনের মনের তুলনায় তিনজনের মনের দাম অনেক বেশি। একজনকে বড় করতে গিয়ে তিনজনকে ছোট করে দিতে চায় না, হিসেবে কমবেশি করতে জানে না টুকু-বউ।

হঠাৎ পোড়া বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বিনু এবং দরজা পার হয়ে চলে গেল। টুকু-বৌ মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে

তাকায় আর ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে—যাক্‌গে, একজন পাগল হলে সবাই পাগল হতে পারবে না।

তবু কিছুক্ষণ আন্‌মনা হয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে টুকু-বৌ। তারপর নিজের মনেই বল্‌তে থাকে—এ রকম যে করে, তাকে বিশ্বাস করি না, তাকে আমার বড্ড ভয় করে। সেদিনই বুঝেছিলাম।

চুপ করে টুকু-বৌ। মুখটা বড় গম্ভীর দেখায়। যেন অনেক সাহস করে তার মনের মধ্যে একটা চাঁদের দেশ তৈরী করে নিয়েছে টুকু-বৌ, যেখানে সবার ওপর সমান মায়া নিয়ে সবার সঙ্গে সে বসে আছে। তাই রাগ করেছে, একটা ছায়ার অভিমান কেন হিংসে ঢুকিয়ে তার এই চাঁদের দেশ কালো করে দিতে চাইছে?

বাড়ি ফেরার সময় টুকু-বৌ আবার বলে—আমরা যেমনটি আছি, তেমনটি থাকবো। আমরা তো আর পাগল হইনি।

যতটা ভয় পেয়েছিলাম, টুকু-বৌয়ের কথা শোনার পর বুঝলাম, এতটা ভয় করার কোন দরকার নেই। শুধু বিন্নুর ওপরেই রাগ করেছে টুকু-বৌ, আমাদের ওপর নয়। শুধু বিন্নুই পাগলামি করছে, আমরা তো করছি না। শুধু বিন্নুর ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে টুকু-বৌ, কিন্তু আমাদের ওপর অগাধ বিশ্বাস। বিন্নুকে ভয় করতে আরম্ভ করেছে টুকু-বৌ, আমাদের নিয়ে কোন ভয় নেই টুকু-বৌয়ের মনে। চতুর্ভুজ ক্লাবের ওপর যেমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে বিন্নু, টুকু-বৌ তেমনি আরও বেশি মায়া দিয়ে ক্লাবকে বাঁচাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি আমাদের টুকু-বৌয়ের মন। বিন্নুর ওপর একটু রাগ না করেও পারছিলাম না আমরা।

চতুর্ভুজ ক্লাব ভাঙেনি, ভাঙবার আর কোন লক্ষণও দেখা দিল না। বরং রবিবার দিনের সকাল বেলায় আরও ভাল করে জমে উঠতো ক্লাব। উঠোনে আমরা ক্রিকেট খেলতাম—আমি, দীপু, নরু আর টুকু-বৌ। শুধু বিনু দাওয়ার ওপর বসে গ্রামোফোন বাজাতো, আর একমনে গান শুনতো। ক্রিকেট খেলার হুল্লোড় আর হাসাহাসির আওয়াজ ওর কানেই যেন পৌঁছতো না।

আরও দেখেছি, কোন রাগ-টাগ নেই বিনুর মনে। চতুর্ভুজ ক্লাবের আনন্দে কোন বাধাই দেয় না বিনু। শুধু নিজে আল্‌গা হয়ে থাকে। চতুর্ভুজ ক্লাবকে কোন দুঃখ না দেবার জন্যই যেন বিনু নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বসে আছে একলা হয়ে, ওর নিজের মনের সব পাগলামিকে কেমন যেন একটা উদাস স্বপ্নের মধ্যে লুকিয়ে রেখে।

থেমে গেল বিনু, কিন্তু চতুর্ভুজ ক্লাব চলছিল। চালাচ্ছিল টকু-বৌ। চলতে চলতে চলে এল পূজোর ছুটির প্রথম দিনটা।

টুকু-বৌ নেমন্তন্ন করেছিল। নারকেল দিয়ে খিচুড়ি রাঁধবে টুকু-বৌ। পূজোর ছুটির প্রথম দিনে সকাল বেলা থেকেই জোর উৎসব জেগে উঠলো চতুর্ভুজ ক্লাবে।

টুকু-বৌ আজ পরেছে সেই শাড়িটা, সেই ফিকে সবুজ রঙ আর তারার মত সাদা সাদা বুটি! গলায় নয়, খোঁপার ওপর একটা সাদা ফুলের মালা জড়িয়েছে। শরৎ কালের ঝিলের মতই টুকু-বৌয়ের চোখ দুটো আজ যেন কানায় কানায় আর ভরা মায়ায় টলমল করছিল। এ-ঘর থেকে ও-ঘর, উঠোন আর দাওয়ার ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে কাজ করছিল টুকু-বৌ। আর খড়ের মাচানের ওপর বসে গল্প করছিলাম আমরা—আমি, দীপু, আর নরু। দেখছিলাম, টুকু-বৌয়ের আল্‌তা-মাখা পা দুটো

যেন একজোড়া পদ্মফুলের মত মাটির ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে যাওয়া আসা করছে।

বিনু কোথায়? বিনু শুয়ে আছে এই ছুটির দিনের উৎসবটাকে একেবারে তুচ্ছ করে ভেতর ঘরের তক্তপোষে, গল্পের বই পড়ছে। চতুর্ভুর্জ ক্লাবকে উপেক্ষা করতে গিয়ে এই পৃথিবীটাকেই উপেক্ষা করে বসলো বিনু। নইলে এই খড়ের মাচানের ওপর বসে দেখতে পেত, আকাশ কত নীল, আর টুকু-বৌয়ের মুখটা কত সুন্দর হয়ে উঠেছে।

আমরা তিনজন এখানে মাচানের ওপর, আর টুকু-বৌ ওখানে রান্নাঘরে। আমাদের গল্পগুলি তেমন করে জমে উঠছিল না, ছটফট করছিল।

টুকু-বৌ মাঝে মাঝে রান্নাঘরের বাইরে এসে আর উঠোন দিয়ে যেতে যেতে বলে যায়—আসছি, আসছি। খুব বেশি দেরি হবে না।

বলতে বলতে এই শরতের রোদের মতই হাসি ছড়ায় টুকু-বৌয়ের মুখ।

আমাদের গল্পগুলিও অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করে শেষে যেন নিঝুম হয়ে গেল। খড়ের গাদার ওপর চুপ করে শুয়ে পড়ে রইলাম আমরা, এলোমেলো হয়ে আর নিজের নিজের মন নিয়ে।

হঠাৎ দীপু উঠে বসে। —এক্ষুনি আসছি।

দীপু চলে যাবার পর আমি আর নরু চুপ করেই রইলাম। গল্প করার মত গল্প খুঁজে আর পাচ্ছিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এল দীপু। গম্ভীর হয়ে একদৃষ্টি তুলে রায় সাহেবের বাগানের চালতে গাছের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। দীপুর মুখটা ভয়ংকর রকমের শুকনো, চোখে একটা ভয়-ভয় ছায়া কাঁপছে।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় গিয়েছিলি দীপু?

দীপু হাসতে চেষ্টা করে—ঐ ওখানে।

—কোথায়?

—টুকু-বৌকে একটু জ্বালিয়ে এলাম।

দীপুর কথায় হাসতে ইচ্ছে করলো না।

দীপু তেমনি চালতে গাছের দিকে রুগ্ন পাখীর মত চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম—খিচুড়ির কতদূর দেখলি?

দীপু বলে—কে জানে, হয়ে এসেছে বোধ হয়।

নরু লাফ দিয়ে উঠেই বলে—দাঁড়া, আমি একবার তাড়া দিয়ে আসি।

নরু চলে যাবার পর আমি চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম। ভাল লাগছিল না কিছু। যেন ছুটির দিনের এত ভাল উৎসবটার প্রাণ থেকে আল্‌গা হয়ে এই খড়ের গাদায় পড়ে আছি। কখন যে টুকু-বৌয়ের খিচুড়ি রান্না শেষ হবে, কে জানে!

নরু ফিরে এল। আমি উঠে বসেই জিজ্ঞাসা করলাম—কতদূর রান্নার?

নরু ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আমতা আমতা করে বলে—কি বললি?

আমি—রান্নার কতদূর?

নরু বিরক্ত হয়ে বলে—তা আমি কি করে বলবো।

আমি বললাম—তবে আমি যাই, টুকু-বৌকে একটু সাহায্য করে আসি।

দীপু ও নরুকে খড়ের মাচানে রেখে আমি এসে ঢুকলাম টুকু-বৌয়ের রান্নাঘরে।

উনুনের ওপর খিচুড়ির হাঁড়ি, হাঁড়িতে খিচুড়ি পুড়ছে, পোড়া

গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে। টুকু-বৌ বসেছিল পিঁড়ির ওপর, দু'-হাঁটুর ওপর মাথা রেখে, একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে। যেন অন্ধ হয়ে বসে রয়েছে টুকু-বৌ, পোড়া খিচুড়ির ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে না। নাকটাও কি অন্ধ হয়ে গেল, নইলে পোড়া গন্ধও টের পায় না কেন?

—টুকু-বৌ?

আমি যে ডাকলাম, তাও শুনতে পেল না টুকু-বৌ। বধির হলো, না ঘুমিয়ে পড়লো?

টুকু-বৌয়ের মাথায় হাত দিয়ে ঠেলা দিলাম—টুকু-বৌ?

টুকু-বউ মুখ তুলে তাকায়। দেখলাম কপালের টিপের কুমকুম ধেবড়ে গেছে। হাসতে চেষ্টা করলো টুকু-বৌ, কিন্তু পারলো না। চোখের চাউনিতে কিরকম একটা ভয় থমকে রয়েছে।

আমি বললাম—খিচুড়ি পুড়ছে যে!

আমার কথা শুনে আর খিচুড়ির দিকে তাকিয়েও চমকে উঠলো না টুকু-বৌ, যেন হাত-পা থেকে সব ব্যস্ততা মুছে গিয়েছে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো টুকু-বৌ এবং হাঁড়িটা উনুন থেকে নামালো। কিন্তু এইটুকুতেই যেন ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে থাকে টকু-বউ, সরে গিয়ে দরজার কাছে কপাট ধরে দাঁড়ায়।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে টুকু-বৌ বলে—কি বলছিলে বলে ফেল ভবানী ঠাকুরপো।

আমি—কই, কিছু তো বলছিলাম না।

টুকু-বৌ—দীপু ঠাকুরপো বলে গেল, নরু ঠাকুরপো বলে গেল, আর তুমি বলবে না?

আমি—কিসের জন্য কি বলবো?

টুকু-বৌ—দীপু ঠাকুরপো আর নরু ঠাকুরপো যেজন্যে যা বলে গেল। এমন মনের মত ছুটির দিনে, যখন আমার খোঁপার

ফুলের মালাটা এত মনের মত হয়েছে, আর এত মনের মত করে খিচুড়ি রাঁধা হয়েছে, তখন মনের মত করে খেতে ইচ্ছে করছে না ?

আমি হেসে ফেলি—করছে বৈ কি।

টুকু-বৌ—তাই তো জিজ্ঞেস করছি, মনের মত ইচ্ছেটা বলে ফেল।

টুকু-বৌয়ের কাছে এগিয়ে, ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম—বড্ড ইচ্ছে করছে টুকু-বৌ, আজ আমি আর তুমি শুধু দু'জনে এঘরে বসে একসঙ্গে খিচুড়ি খাই। ওদের সবাইকে খেতে দিও দাওয়ার ওপর। এখানে শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়।

টুকু-বৌ—এই তো, এতক্ষণে বলতে পেরেছ। দীপু ঠাকুরপো যা বললে, নরু ঠাকুরপো তাই বললে, তুমিও তাই বললে।

চুপ করে আর অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে টুকু-বৌ। যেন একটা অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি হারিয়ে একা থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সেই জ্যোৎস্নার আড়ালে যে কালোছায়াটা ছিল, সেটাকে এতদিনে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছে টুকু-বৌ। যেন টুকু-বৌয়ের আত্মাটাকে চার টুক্‌রো করে সমান সমান ভাগ করতে চাইছে কালো-ছায়া।

আতঙ্কিত হ'য়ে চেঁচিয়ে ওঠে টুকু-বৌ—যাও, যাও ভবানী ঠাকুরপো, সবাই গিয়ে একসঙ্গে দাওয়াতে বসো, এক্ষুনি খেতে দিচ্ছি। সবাই যখন পাগল, তখন এক পাগলই…।

শুনতে পেলাম না টুকু-বৌয়ের শেষ কথাটা। ছুটে চলে গেল কু-বৌ। এক দৌড় দিয়ে দাওয়া আর উঠোন পার হয়ে একেবারে ভেতর-ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো, যেখানে বিনু একমনে গল্পের বই পড়ছে।

দাওয়ার ওপরে একসঙ্গেই বসে আমরা খিচুড়ি খেলাম। আমি

দীপু আর নরু। খিচুড়িটা একটু ধরে গিয়েছিল ঠিকই, তবু খারাপ হয়নি খেতে। কিন্তু খাওয়াটা একেবারেই ভাল লাগলো না।

বিনু এসে বসলো একটা মোড়ার ওপর, এবং বসে বসে আমাদের খাওয়া দেখলো। দীপু ধীরে সুস্থে অলসভাবে খাচ্ছে দেখে বিনু চেঁচিয়ে উৎসাহ জানায়—গো গ্রাসে হুস্ হুস্ করে খা দীপু, নইলে তোর পেট ভরবে কি করে?

দীপু কোন কথা বললো না।

টুকু-বৌ জিজ্ঞেসা করে—আর এক হাতা দিই নরু ঠাকুরপো?

নরু কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানায়—না।

আমার দিকে তাকিয়ে বিনু বলে—ভবানীর কি হয়ে গেল নাকি?

আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না। মাথা নেড়ে জানাই—হ্যাঁ।

একটিও কথা বলিনি আমরা, বলতে পারিনি। চতুর্ভুজ ক্লাবে নয়, আমরা যেন তিনটি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক স্বর্গীয় দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীতে বসে রয়েছি। বিনু আর টুকু-বৌ, দীনবন্ধুবাবুর পুত্র আর পুত্রবধূ যেন বাইরের তিন জন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রতা করছেন। এই মাত্র।

টুকু-বৌ বিনুকে বলে—তুমি চান ক'রে এস। আর দেরি করছো কেন?

বিনু বলে—তুমি আগে চান ক'রে এস, আমি বইটা ততক্ষণ শেষ করে নি, তারপর।

তারপর বিনু আর টুকু-বৌ একসঙ্গে খেতে বসবে, এই তো ব্যাপার। বিনু মুখ খুলে না বললেও ওর চোখ দেখে সেটুকু বুঝতে পারছিলাম, সহ্য করতেও পারছিলাম। শুধু পারছিলাম না কোন কথা বল্‌তে, কেউ যেন গলা টিপে হঠাৎ আমাদের সব কথার আবেগ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র, চট্‌পট্‌ আঁচিয়ে নিয়ে তিনজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি দীপু আর নরু।

বিনু বলে—এখন তোরা তাহ'লে…।

বুঝলাম, বিনু আমাদের পা-গুলিকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে চাইছে না, এই মুহূর্তেই চলিয়ে দিতে চাইছে। সুতরাং কোন কথা না বলেই আমরা দরজার দিকে পা বাড়ালাম। চললাম।

টুকু-বৌ পেছু থেকে হঠাৎ ডাক দেয়—ভবানী ঠাকুরপো!

মুখ ফিরিয়ে তাকাই। টুকু-বৌ বলে—তোমাদের জিনিসগুলি নিয়ে যাও ভাই, এখানে মিছিমিছি ফেলে রেখে নষ্ট ক'রে লাভ নেই।

বুকের ভেতর কি যেন একটা চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল, তারই শব্দ শুনে থম্‌কে রইলাম আমরা। বোধহয় এতদিনে চূর্ণ হলো চতুর্ভুর্জ ক্লাব, তারই শব্দ। চূর্ণ ক'রে দিল টুকু-বৌ।

আমাদের জিনিস? হ্যাঁ মনে পড়লো, এখানে আমাদের তিনটে জিনিস আছে। গ্রামোফোনটা, সাইকেলটা আর ক্যামেরাটা। তা ছাড়া আর কিছুই না।

ঘরের ভেতর থেকে টানা হ্যাঁচ্‌ড়া করে বের করলাম জিনিস-গুলিকে। নিজের নিজের জিনিস নিজের নিজের হাতে তুলে নিলাম। চললাম। উঠোনের ওপর বিনু, আর বিনুর পাশে টুকু-বৌ নিঃশব্দে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটাকে দেখলো। চতুর্ভুর্জ ক্লাব মরে গেল, তার জন্যে কি একটুও ব্যথা লাগলো না ওদের কারো চোখে?

না মিথ্যে নয়, দেখতে ভুল হয়নি আমার। উঠোন পার হয়ে খিড়কির দরজার কাছে এসেই একবার আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। স্পষ্টই দেখতে পেলাম, বিনুর চোখ চিক্‌চিক্‌ করছে, আর টুকু-বৌয়ের চোখ থেকে জল পড়ছে ঝর ঝর করে।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দরজা পার হয়ে আমরা চলে গেলাম। পেছনে কিছু আর নেই। নেই চতুর্ভুর্জ ক্লাব, নেই আমাদের ফেলে আসা

কোন জিনিস। চতুর্ভুজ ক্লাব ভেঙ্গেই যায়, পৃথিবীতে চতুর্ভুজ ক্লাব বোধহয় হতেই পারে না। তবে আর কি ?

আর কিছুই নয় ; ঘড়াং ক'রে রায় সাহেবের দোতলার জানলা খুলে গেল। দেখতে পেলাম, এক জোড়া গোল-গোল চোখ আর এক জোড়া ড্যাবা ড্যাবা চোখ বিনুদের বাড়ির উঠোনের দিকে উঁকি দিয়ে তাকিয়েছে।

বিসূচিকা মাসি ঘড়্ ঘড়্ স্বরে যেন মাথার ওপরের শুকনো ও কঠোর আকাশটাকে প্রশ্ন করেন—কি রে, কি রে ?

বাতুলদি উত্তর দেন—একটা বাঁদর আর একটা বাঁদরী।

আকাশবৃত্তি

মাধব চক্রবর্তীর জীবনটাই একটা বিস্ময়।

এটা কিন্তু প্রশংসার কথা নয়। খুবই চিন্তার কথা। কোন কাজ না করে; কোনদিন একটুও উদ্বিগ্ন না হয়ে, কেমন ধীর স্থির ও শান্তভাবে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে মাধব চক্রবর্তী।

বয়সটাও পঞ্চাশ পার হতে চলেছে। কিন্তু জীবনের শেষ পালার দিনগুলির জন্যেও যেন কোন উদ্বেগ মাধব চক্রবর্তীর ভাবনা বিচলিত করে না। প্রশান্ত মনে ঘরের আঙ্গিনার এক কোণে একটা মোড়ার উপর ধীর স্থির হয়ে বসে এক একটা বেলা পার করে দিতে পারেন মাধব চক্রবর্তী। হাতে জপের মালা নেই, কোন ধর্মগ্রন্থও থাকে না, শুধু যেন এক পরম আলস্যের আরামে সমাহিত হয়ে বসে থাকা। লোভী কাকটা আঙ্গিনার পাশের পেয়ারা গাছে বসে পাকা পাকা পেয়ারা ঠুকরে ফেলে দিচ্ছে। হাত তুলে লোভী কাকটাকে একটা তাড়াও দেন না মাধব চক্রবর্তী। দৃশ্যটা যেন মাধব চক্রবর্তীর চোখেই পড়ে না।

হ্যাঁ, রাজেন যখন ডাক দেয়, ভাত খাবে এসো বাবা, তখন মাধব চক্রবর্তীর এই আলস্যের সমাধিটা যেন নড়াচড়া করে আস্তে আস্তে ভাঙ্গতে থাকে। পুকুর ঘাটে গিয়ে স্নান করেন মাধব চক্রবর্তী। তারপরেই ভাত খাওয়া সেরে নিয়ে আবার আঙ্গিনার এক কোণে একটা মোড়ার উপর বসে থাকেন।

রাজেন, মাধব চক্রবর্তীর এই ছেলেটার বয়স এখন মাত্র যোল বছর। এখন এই ছেলেটার রোজগারেই মাধব চক্রবর্তীর ঘরের উনানে হাঁড়ি চড়ে। ছেলেটা পাশের গাঁয়ের জমিদার বাড়ির

সেরেস্তায় হিসাব লেখে, আর তার পাশের গ্রামের এক জমিদারের তিনটে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে অঙ্ক শেখায়। তাই মাধব চক্রবর্তীর বাড়িতে রোজ দু'বেলা না হোক্, অন্তত এক বেলা উনান জ্বলে, হাঁড়ি চড়ে আর ভাতও হয়।

কিন্তু মাধব চক্রবর্তীর কোন অভিযোগ নেই। দু'বেলা ভাত হলে যেমন তৃপ্তি, একবেলা ভাত হলেও যেন তেমনই তৃপ্তি।

রাজেন যখন ছোট ছিল, তখনও মাধব চক্রবর্তীর এই তৃপ্তি আর প্রশান্তি আর আলস্য অটুট ছিল। তখন ভাত যোগাড়ের সব দায় যার উপর ছিল, সে এখন আর বেঁচে নেই। রাজেনের মা গ্রামের এপাড়া আর ওপাড়া ঘুরে, এবাড়ি আর সে-বাড়ির গৃহিনীদের নিত্যদিনের কাজে খেটে দিয়ে, কখনও বা শুধু আবেদন করে চেয়ে নিয়ে, যে চাল-ডাল যোগাড় করে নিয়ে আসতেন, তাতেই মাধব চক্রবর্তীর সংসারের প্রাণটা দু'বেলার না হোক, অন্তত এক বেলার খোরাক পেয়ে যেত। মাঝে মাঝে কোন দিন দু'বেলা উপোসে কাটাতে হলেও মাধব চক্রবর্তী অভিযোগ করেন নি। সকাল দুপুর আর বিকেল ঠিক এভাবেই অঙ্গিনার এক কোণে চুপ করে বসে থেকেছেন, আর সন্ধ্যা হলেই দাওয়ার উপর মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছেন।

অভিযোগ করা দূরে থাক, কোনদিন চেঁচিয়ে কথা বলেন নি মাধব চক্রবর্তী ; এখনও বলেন না। সারাক্ষণ চুপ করে বসে থেকেও মাধব চক্রবর্তীর মুখটা কখনও গম্ভীর হয় না। বরং, দেখা যায় যে, বেশ শান্ত একটা হাসি ফুটে আছে মাধব চক্রবর্তীর মুখে।

গ্রামের মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলেন মাধব চক্রবর্তী, তখনও এই অদ্ভুত শান্ত হাসিটা তাঁর চোখে মুখে লেগেই থাকে।

—কি হে চক্রবর্তী, শুনলাম রাজেনের মা'র নাকি খুব জ্বর ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও হেসে কথা বলেছিলেন মাধব চক্রবর্তী—হ্যাঁ, খুব জ্বর।

এই তো, তিন বছর আগে রাজেনের মা তিন দিনের জ্বরে ভুগে যেদিন চোখ বুজেছিলেন, সেদিন মাধব চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে গ্রামের মানুষের মন সত্যিই বেশ রাগ করেছিল। শশ্মান ঘাটে বসে কেমন শান্ত দুটি চোখ তুলে জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন মাধব চক্রবর্তী। শান্ত চোখ দুটো যেন শান্ত হাসির দুটো চোখ। আর মুখটা অবিকার। সেই তৃপ্ত আর প্রশান্ত মুখ।

হরনাথবাবু ফিসফিস করে বলেছিলেন, লোকটা হয় পিশাচ, নয় ঋষি।

রাজেনের মা মারা যাবার পর, রাজেনই মাধব চক্রবর্তীর সংসারের অন্নচিন্তার সহায়। ঐটুকু ছেলেই ভিন্ গ্রামের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে আর হিসেব লেখার কাজ ক'রে দু'বেলার না হোক্ একবেলার ভাত যোগাড় করে।

গ্রামের সবাই ভেবেছিল, এইবার বিচলিত হবেন মাধব চক্রবর্তী। অন্তত কিছুদিনের জন্য মাধব চক্রবর্তীকে এই নিদারুন কুঁড়েমির আরাম থেকে সরে আসতে হবে; খাটতে হবে; কাজ করতে হবে। তা না হলে খাবে কি লোকটা?

রাজেন একটা চাকরী পেয়েছে। যুদ্ধের চাকরি। তা'ও আবার এদেশে নয়; অনেক দূরে সিঙ্গাপুর গিয়ে এক সেনাশিবিরে কেরনীর কাজ করতে হবে।

মাইনে একরকম মন্দ নয়। কিন্তু নিজের খাওয়া-পরার জন্য খরচ করে মাইনে থেকে কি-ই বা বাঁচাতে পারবে রাজেন? যদি নেহাৎই কিছু বাঁচাতে পারে আর বাপকে পাঠায়, তবু তো বেশ

কিছুদিন দেরী হবে। অন্তত দু' তিনটে মাস না গেলে রাজেন যে টাকা পাঠাতে পারবে না ; এটা বুঝতে অসুবিধে নেই।

সবাই বুঝেছে ; কিন্তু মাধব চক্রবর্তী বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

রাজেন যেদিন মাধব চক্রবর্তীকে প্রণাম করে রওনা হয়ে গেল, সেদিনও গ্রামের মানুষ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, কেমন শান্তটি হয়ে আঙ্গিনার এক কোণে মোড়ার উপর বসে আছেন মাধব চক্রবর্তী। রাজেনকে একটুও বাধা দিলেন না, কোন অভিযোগ কিংবা অনুরোধও করলেন না। রাজেন চলে যাবার পরেও দেখা গেল, মাধব চক্রবতীর চোখ-মুখ তেমনই নিবিড় আলস্যের আরামে যেন মুগ্ধ হয়ে হাসছে। ঘর শূন্য হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মাধব চক্রবর্তীর প্রাণটা যেন নিজেরই শূন্যতার গৌরবে ধন্য হয়ে বসে আছে।

হরনাথবাবু একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বলে গেল রাজেন ? মাসে মাসে টাকা পাঠাবে ?

মাধব চক্রবর্তী তেমনই শান্ত হাসির মুখ তুলে বললেন—কই ? রাজেন তো কিছু বলেনি।

—তুমিও কি কিছু জিজ্ঞাসা করনি ?

—না।

—তাহলে বল, রাজেন কিছু টাকা পয়সা দিয়ে গিয়েছে।

—না।

—হেসে হেসে এত না-না তো করছো, কিন্তু ভেবে দেখেছো কি ? পেট চলবে কি করে ?

মাধব চক্রবর্তী শুধু চুপ করে আর হাসি মুখ তুলে হরনাথবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কোন কথা বলেন না।

হরনাথবাবু এইবার সত্যিই একটু বিস্মিত হয়ে চলে যান। গ্রামের মানুষও বিস্মিত হয়। লোকটার প্রাণটা কি পাথর

দিয়ে তৈরী? এখনও নির্বিকার। ভাল-মন্দ একটা বোধও নেই। কি আশ্চর্য!

এই হরনাথবাবু একদিন চমকে উঠ:লন।

দেখতে পেলেন হরেনবাবু; মাধব চক্রবর্তীর হাতে একটা ঘটি আর একটা কাঁথা। কোথায় যেন চলে যাচ্ছেন মাধব চক্রবর্তী। মুখে সেই প্রশান্ত হাসি।

—কোথায় চললে মাধব?

—আকাশ-বৃত্তি।

—তার মানে?

—বাকি দিনগুলি আকাশ-বৃত্তি করে পার করে দিতে চাই।

আকাশ বৃত্তি! কথাটা হরনাথবাবুর কাছে নতুন কথা অবশ্য নয়। তিনি নিজেই কতবার গল্প করে অন্য গাঁয়ের মানুষের কাছে গর্ব করেছেন—আমাদের এই গাঁয়ের তিনজন ব্রাহ্মণ আকাশ-বৃত্তি করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

গ্রামের বাইরে নদীর কিনারায়, কোন বটের ছায়ার কাছে একটি একান্ত নিরালায়, একটি পাতার কুটিরের নিভৃতে বাস করে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন পার করে দিতে হয়। কারও কাছে এক কণা চাল চাইবারও নিয়ম নেই। যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় এসে কিছু চাল-ডাল দিয়ে যায়, তবেই খাওয়া হবে; নইলে নয়। অন্ন চিন্তা করবার কোন অধিকারই নেই। পুরাণের গল্পে আছে, কঠোরতপা মুনি-ঋষিরা শুধু বায়ু পান করে জীবনধারণ করতেন। আকাশবৃত্তি যে সেইরকমই একটা ভয়ানক কঠোর বৃত্তি। মাধব চক্রবর্তী এহেন আকাশ বৃত্তি করবার সাহস করে; কি আশ্চর্য!

কিন্তু দেখা গেল, সত্যিই আকাশবৃত্তি নিয়ে নদীর কিনারায়

একটা বটের ছায়ায় বসে আছেন মাধব চক্রবর্তী; এ খবর জানে সবাই; দেখেছেও অনেকে। ভিন্ গাঁয়ের লোকেরাও দেখেছে।

কিন্তু একদিন হেসে ফেললেন হরনাথ বাবু—মাধব চক্রবর্তীটা বোকা নয়। ভয়ানক চালাক; অতি ভয়ানক চালাক।

—কেন?

—আকাশবৃত্তির দয়াতে আজকাল যা খাচ্ছে মাধব, তেমন খাওয়া জীবনে কোনদিন খেতে পায়নি। রোজই খিচুড়ি রাঁধছে; পায়েস টায়েসও চলে। তা ছাড়া ফলটলও কম জুটছে না।

—কোথা থেকে জুটছে?

—দশটা গ্রামের লোক দিচ্ছে। হাটের দিনে তো কথাই নেই; লোকের দানের সিধায় মাধবের উপোসী ঘর প্রায় একটা মুদিখানা হয়ে ওঠেছে। শুনলাম মাধব নিজেও আজকাল নাকি দানটান করে। ভিখিরী দেখতে পেলে ডাক দিয়ে চাল ডাল দেয়।

সনাতনও একদিন গিয়ে দেখে এসেছে, বেশ গোলগাল নাদুশনুশটি হয়েছে মাধব চক্রবর্তীর বুড়ো বয়সের চেহারা।

ভোলা ভটচাজ বলে—আকাশবৃত্তি নয় হে; পায়েস বৃত্তি। হাঁড়ি ভর্তি পায়েস।

যেমন হরনাথ বাবু, তেমনই আরও অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন। রাজেন জাপানী বোমায় মারা গিয়েছে, খবরটা কি শোনেনি মাধব?

ভোলাবাবু বলেন—শুনেছে; আমিই সেদিন শুনিয়ে এসেছি। কিন্তু…

—কি?

—কিন্তু, মাধব চক্রবর্তী তাতে একটুও দুঃখিত হয়েছে বলে মনে হলো না।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে। একটা কথাও বললে না; চুপ করে আকাশপানে তাকিয়ে শুধু হাসলো।

—হাসবেই তো। আকাশ-বৃত্তি যখন ভাল মত চলছে, আর পায়েস-টায়েস জুটছে, তখন ছেলের মৃত্যুতেও ওর কোন চিন্তা নেই।

গ্রামের মানুষের প্রাণ কিন্তু এরই মধ্যে একটা আতঙ্কের আঘাতে সব হাসি হারিয়েছে। গ্রামের কিছু মানুষ চলেও গিয়েছে। চারদিকে অন্নাভাবে হাহাকার পড়েছে। দুর্ভিক্ষ। সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন, এ জেলাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

হরনাথ বাবুর মত অবস্থার মানুষও একবেলা ভাত খান। ভোলা বাবু বাড়ি বিক্রী করে দিয়েছেন। সনাতনের এত বড় গোয়ালটাও শূন্য; সব গরু বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে।

তবু দুর্ভিক্ষের ভয় যেন সারা গ্রামের প্রাণের উপর একটা অভি-শাপের মত চেপে বসে আছে। ভিখিরী এলে গ্রামের মানুষ রাগ করে তাড়া দেয়। কোন সাধু এসে দিঘির ধারে সারাদিন বসে থাকলেও ভাত পায় না। কে দেবে ভাত? সবাই যে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার চিন্তাতেই বিপন্ন। যার ঘরে পাঁচ সের চাল আছে, সেও সাবধানে কথা বলে, কেউ যেন টের না পায় যে ঘরে পাঁচ সের চাল আছে।

এই রকমই আতঙ্কের একটি দিনে হরনাথ বাবু সারা গাঁয়ের মানুষকে একটা খবর দিয়ে চঞ্চল করে তুললেন।—ওহে, মাধব চক্রবর্তী যে যেতে বসেছে।

—কি হলো?

—আজকাল সত্যিই আকাশ-বৃত্তি করছে মাধব। শুধু হাওয়া খেয়ে কোন মতে বেঁচে আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে···।

—কি ?

—ভাতটাত না পেলে মাধব আর বাঁচবে না।

—ভাত-টাত পাচ্ছে না কেন ?

—কে দেবে ভাত ? সবাই যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। দু'মুঠো চাল দেবার সাহস করবে কে ?

—কেন ? নদীর ধারেই তো একটা সরকারী লঙ্গরখানা খুলেছে। মাধব চক্রবর্তী ইচ্ছে করলেই, সেখান থেকে কিছু ফেনভাত পেতে পারে।

হরনাথ বাবু হাসেন—আকাশ-বৃত্তিতে বাধে। ভিক্ষে করা বা চাওয়া কিংবা কোথাও গিয়ে ভাতের জন্য হাত পাতা নিষেধ।

—তা হলে তো লোকটা মরেই যাবে মনে হচ্ছে।

—সেই জন্যেই বলছি ; একটা ব্যবস্থা করা উচিত।

—কি ব্যবস্থা , বলুন।

—চল, এক বাটি সাগুর পায়েস আর কিছু ফল যোগাড় করে নিয়ে মাধবকে খাইয়ে আসি।

কে জানে সেদিন কী ছিল আকাশের মনে! তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল ; আর আকাশ থেকে নদীর বুকে অদ্ভুত রকমের জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছিল। মাধব চক্রবর্তী তাঁর ঝিরঝিরে শীর্ণ চেহারাটা নিয়ে বেশ শান্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

হরনাথ বাবু সাগুর পায়েসের বাটিটা মাধব চক্রবর্তী চোখের সামনে মাটির উপর রেখে দিয়ে অনুরোধ করলেন—খেয়ে নাও মাধব। তারপর একটু জল খাও। আর একটু পরে এই ফলগুলি খেও।

মাধব চক্রবর্তীর শান্ত মুখটা যেন শান্ত জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিলে

মিশে হাসছে। অদ্ভুত হাসি। যেন মাধব চক্রবর্তী সারা জীবনের আলস্যের আর অব্যস্ততার প্রতিজ্ঞাটা গর্ব করে হাসছে। যেন আকাশের সঙ্গে প্রাণটাকে মিশিয়ে দেবার আনন্দে তৃপ্ত আর কৃতার্থ হয়ে মাধব চক্রবর্তীর চোখ দুটো হাসছে।

—খেয়ে নাও মাধব। আবার ডাক দিলেন হরনাথ বাবু।

মাধব চক্রবর্তী আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে হাসতে থাকেন—না।

হরনাথ বাবু বলেন—এ তোমার কি রকমের জেদ?

না, জেদ নয়। দেখে মনে হয়, মাধব চক্রবর্তী যেন সেই পরম আলস্যের সুখে মুগ্ধ হয়ে বসে আছেন। সাগুর পায়েস আর ফল-মূলের দিকে তাকাবার একটুও আগ্রহ নেই। একটুও চেষ্টা নেই; কি ভয়ানক নির্ভীক আলস্য!

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলেন ভোলা বাবু—এ কি হলো? এ কি হলো?

মাধব চক্রবর্তীর সেই অলস শরীরটা গাছের গায়ের উপর ঢলে পড়েছে।

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন হরনাথ বাবু—এ কী কাণ্ড করলে মাধব? তুমি সত্যই ঋষি ছিলে নাকি মাধব?

ভোলা বাবু আস্তে আস্তে মাধব চক্রবর্তীর নিষ্প্রাণ শরীরটাকে দু'হাতে ধরে মাটির উপর শুইয়ে দিলেন।

দুঃসহধর্মিণী

সেদিন আর এদিন, মাঝখানে প্রায় বারো বছরের ব্যবধান। সে জায়গাটা ছিল নদে জেলার এক পাড়া গাঁ, আর এ জায়গাটা হলো বরাকরের ধারে একটা অভ্রখনি। সেদিন যে ঘরে দু'জনে প্রথম মুখোমুখি বসে কথা বলেছিল, সে ঘরটা ছিল মাটির তৈরী, পাশে একটা পানা-ঢাকা পুকুর, চারদিকে আলোকলতার ঝোপ। আর আজ যেখানে বসে দু'জনে কথা বলছে, সেটা হলো কংক্রীটে তৈরী নতুন একটা বাংলো, সিমেণ্ট-করা বারান্দা, তার ওপর চকচকে কালো পালিশ। পাশেই দুটো উদ্ধত ইউক্যালিপটাস, চারদিকে শালবন এবং তার ভেতরে অনেকগুলি ছোট-বড় অভ্রখনি। সেদিন কমলেশের বয়স ছিল তিরিশ, আর ধীরার বয়স ছিল আঠার। দু'জনের মধ্যে সেদিন যে সমস্যা ছিল, আজ আর সে সমস্যা একেবারেই নেই। আজ দু'জনে বর্ণে বর্ণে এবং ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে এক হয়ে গেছে।

সকাল বেলায় রোদ এখনো তেমন কিছু তেতে ওঠেনি। তবু একটু ক্লান্ত হয়ে এবং ঘামন্ত মুখ নিয়ে বসেছিল ধীরা। আগাকেগ ব্রাদার্সের জেনারেল ম্যানেজার রাওয়ের বাংলোতে গিয়ে এক হাত টেনিস খেলে এই মাত্র ফিরেছে ধীরা।

কমলেশও ফিরেছে এই কিছুক্ষণ হলো। ঐ যে বাংলো থেকে সামান্য একটু দূরে শিশিরভেজা মাঠটা এখনো চিকচিক করছে, তারই এক কিনারায় দাঁড়িয়ে পোষা স্প্যানিয়েলকে কাঠবেড়ালীর পেছনে ছুটিয়ে একটু ক্লান্ত করিয়ে নিয়ে, নিজে অক্লান্তভাবেই এসে সোফার ওপর বসেছে এবং মাত্র পাইপটা ধরিয়েছে।

এই সকালবেলাটার মতই দুজনে বেশ রঙীন ও উজ্জ্বল। পার্থক্য

শুধু, ধীরা একটু ক্লান্ত এবং কমলেশের কোনই ক্লান্তি নেই। ধীরার হাসি সেতারের তারের মত বেজে উঠেই যেন তার ছিঁড়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, কোন রেশ থাকে না। কমলেশের হাসিতে এ রকম আকস্মিক ছন্দপতন নেই। হাসিটা একটা তির্যক রেখার মত দু'ঠোঁটের ওপর অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে থাকে।

কমলেশের দু'ঠোঁটে এই তির্যক হাসির রেখা যেদিন প্রথম দেখেছিল ধীরা, সেদিন আর এদিনে তফাৎ অনেক। সেদিনটা ঠিক দিন ছিল না, ছিল রাত্রি। ঠিক ঘর নয়, বাসর ঘর। এ রকম রোদের আলো নয়, পেতলের পিলসুজের ওপর তিল তেলের প্রদীপের ছোট একটি শিখার আলো। নদে জেলার পাড়া-গাঁয়ের স্কুল মাষ্টারের মেয়ে ধীরা; দু'চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে শুনছিল, স্বামী কি বলছেন।

কমলেশ বলেছিল—তুমি তো আমার অচেনা নও, অজানা নও, অদেখা নও ধীরা। তুমি আমার চিরকালের। যুগ যুগ ধরে তোমাকেই চিনেছি, তোমাকেই খুঁজেছি আর তোমাকেই পেয়েছি।

বিস্ময়ে দুই ভুরু টান ক'রে ধীরা বলে—কিন্তু আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। আমি তো কখনো পাটনা যাইনি, আপনাকেও আগে কখনো দেখিনি।

কালচার্ড কমলেশের চোখ দুটো যেন আকস্মিক একটা আঘাতে আরও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। ধীরার মুখের দিকে অপলক চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কমলেশ। তার পর দুঠোঁটের ওপর তির্যক ভঙ্গিতে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে এবং নিঃশব্দে কাঁপতে থাকে।

নদে জেলার পাড়াগাঁয়ের স্কুল মাষ্টারের মেয়ে সে হাসির অর্থ বোধ হয় তখনি বুঝতে পারেনি। মাথা হেঁট করে ধীরা এবং তার নিজের মুখের হাসিটাকেই সলজ্জভাবে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে।

কমলেশ বলে—একেই বলে দুঃসহধর্মিণী।

চম্‌কে চোখ তুলে তাকায় ধীরা, এবং মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। জিজ্ঞেসা করে—কি বললেন ?

কমলেশ—বুঝলাম, আমাকে অনেক দুঃখু ভুগতে হবে।

ধীরা—কেন মিছিমিছি এ সব খারাপ কথা বলছেন ? আমি থাকতে আপনি দুঃখু ভুগবেন কেন ?

কমলেশ—তুমিই তো ভোগাবে।

ধীরা—আমি ?

কমলেশ—হ্যাঁ।

আর একবার চম্‌কে ওঠে ধীরা, আর শাস্তিভীরু সন্ত্রস্ত অপরাধীর মত দু'চোখ সজল ক'রে তাকিয়ে থাকে। বুঝে ফেলেছে ধীরা, কিছু একটা দোষ এরই মধ্যে তার ব্যবহারে হয়ে গেছে। শুধু বুঝতে পারে না, কোথায় দোষ হলো।

কমলেশ বলে—এ রকম শিক্ষা-দীক্ষা, আর এই রকম গেঁয়ো কালচার নিয়ে তুমি জীবনে আমাকে কতটকু সাহায্য করতে পারবে ?

ধীরার মনে হয়, সারাদিনের এত শাঁখ আর উলুর প্রাণ-মাতানো শব্দগুলি এতক্ষণে মিথ্যে হয়ে গেল। আজ সকাল থেকে এই মাটির ঘর আর ঐ আলপনা-আঁকা আঙ্গিনা যে আনন্দ গায়ে মেখে একেবারে ধন্য হয়ে আছে, সে আনন্দের গায়ে যেন আগুন লাগলো এতক্ষণে। কি সুন্দর বর হয়েছে! ধীরির ভাগ্যি দেখে হিংসে হয়। ইস্কুল মাস্টারের ওপর ভগবান খুব দয়া করেছে, নইলে এত সস্তায় এত রূপের ও গুণের জামাই কি এমনিতে হয়। এই ধরনের কত কথার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি আজ সকাল থেকে এ পাড়াগাঁকে মুখর করে রেখেছে। মনে পড়ে, সবই এক মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে। দিদিমা আনন্দে কেঁদে ফেলেছেন। বাবার মুখটাকে কোন দিন এত খুসি হয়ে উঠতে দেখেনি ধীরা। ছোট-বোনের বর-ভাগ্যি দেখে

মেজদি তো এরই মধ্যে গর্ব করতে করতে গাঁয়ের এ-বাড়ি সে-বাড়ি এবং অনেক-বাড়ির জামাইদের নিন্দে করে ফেলেছে। কিন্তু যাকে নিয়ে এবং যার জন্যে এত গর্ব ও আনন্দ, সে কি বলছে ? ঐ সর্বনেশে কথা এখনো কারও কানে পৌঁছয়নি। কেউ জানে না, ধীরির বর এরই মধ্যে ধীরিকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করেছে।

কেঁদে ফেলে ধীরা এবং কোন কথা না বলে সোজা একটা হাত এগিয়ে দিয়ে কমলেশের পায়ের পাতা শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে।

কমলেশ বলে—এ কি ?

ধীরা বলে—ছুঃখু করো না তুমি, আমার ওপর রাগ করো না। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি সে রকম হবো না।

কমলেশ—কি রকম হবে না ?

ধীরা—ঐ যা বললে…।

কমলেশ—কি ?

ধীরা—ছুঃসহধর্মিণী।

হেসে ফেলে কমলেশ—তাহলে কথার অর্থটা বুঝতে পেরেছ ?

ধীরা—পেরেছি বৈকি। তুমি যা শেখাবে তাই শিখবো। কখ্খনো অন্য রকম হবো না।

কমলেশ—শিখতে পারবে তো ?

ধীরা—বিশ্বাস করো, নিশ্চয় পারবো।

কমলেশের ছু'ঠোঁটে তির্যক হাসির রেখা এতক্ষণে শান্ত হয়। সান্ত্বনার সুরেই কমলেশ বলে—কিছু মনে করো না ধীরা। তুমি দেখতে এত সুন্দর, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা ও কালচারেও সুন্দর হয়ে উঠবে, তবেই তো আমাদের ছু'জনের জীবন এক সঙ্গে সুখী হয়ে উঠবে ?

পেতলের পিলসুজে সারা রাত ধরেই বাতি জ্বলে। সারা রাত ধরে কত গল্পই না বললো কমলেশ। বড় বড় বইয়ের ভাষায় মত সে

গল্পের ভাষা। তার মধ্যে ইংরিজী কথা আছে, কবিতার লাইন আছে, এক মস্ত উঁচু জীবনের কত আশা, কত ইচ্ছা, আর কত স্বপ্নের কথা। জীবনে কত কি এখন করতে হবে, তারই নানা প্রতিজ্ঞার কথা। ছাত্রীর মত এক গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে, উৎকর্ণ হয়ে এবং এক মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে ধীরা। বারো বছর আগের সেই ক্ষুদ্র বাসর ঘরের ফুল ছড়ানো বিছানায় বসে ধীরার শেখবার পালা সুরু হয়ে যায়।

রাত্রি ভোর হতে মাত্র ঘণ্টা দুই বাকি ছিল, কিন্তু তার মধ্যেই অন্তত এইটুকু শিক্ষা পেয়ে গেল ধীরা যে, এ স্বামী যেমন-তেমন স্বামী নয়। এ মানুষ যে-সে মানুষ নয়। লোকের মুখে শুনে এবং প্রথম চোখে দেখে যত মহৎ মনে হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী মহৎ। অনেক বেশি বিদ্বান, অনেক বেশী উচ্চরুচি ও অনেক বড় সাধের মানুষ।

ভোর যখন প্রায় হয়ে এলো, পাড়াগাঁয়ের গাছের মাথায় জোনাকী নিভলো, আর পাখি জাগ্‌লো, তখন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ধীরা। কমলেশ তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চোখের সব লোভ আর আর কৌতুহল ভাল করে মিটিয়ে নিয়ে কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ধীরা। কত উঁচু আকাঙ্ক্ষার একটা মানুষ এবং জীবনে অনেক বড় হয়ে উঠ্‌বার জন্যে কত বড় প্রতিজ্ঞার একটা মানুষ তারই স্বামী হয়ে, কেমন শান্ত ও সুন্দর হয়ে পাড়াগাঁয়ের এই বাসর ঘরের নিভৃতে ঘুমিয়ে রয়েছে। দেখতে কি ভালই না লাগছে! ধীরা যেন মনের আশ মিটিয়ে তারই জীবনের এক স্বপ্নেরও অগোচর সৌভাগ্যের শান্ত ও ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এখন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে না, ঐ ঠোঁটে অমন একটা ভয়ানক একটা বাঁকা হাসি সত্যিই কিছুক্ষণ আগে ফুটে উঠেছিল।

বাসরঘর ছেড়ে এক দৌড়ে আল্‌পনা আঁকা আঙ্গিনা পার হয়ে আর একটা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে ধীরা। ঘরে অন্ধকার এবং মেজের ওপর ঢালা বিছনার সুষুপ্ত বাচ্চা-কাচ্চাদের একটা গাদা। তারই মধ্যে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে মেজদিকে খুঁজে বার করে ধীরা। মেজদির গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। মেজদির ঘুম ভাঙ্গে এবং ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে—কি লো, কমলেশকে বলে এসেছিস তো?

ধীরা—না।

মেজদি আরও ব্যস্তভাবে বলেন—যা যা, মুখ্যু মেয়ে। বরকে না জিজ্ঞেস করে বাসর ছেড়ে আস্‌তে নেই।

ধীরা—কেন?

মেজদি—ভয়ানক রাগ করবে।

ধীরা—একটুও রাগ করবে না।

মেজদি একেবারে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেন এবং বোনের বর-ভাগ্যি দেখে আহ্লাদে চেঁচিয়ে ওঠেন—অ্যাঁ, এরই মধ্যে তাহ'লে বরকে বশ ক'রে ফেলেছিস ধীরি, কি বলিস্?

মেজদি যেন অন্ধকারের মধ্যেই ছোট বোনের হাসিভরা মুখটাকে দেখতে পেয়ে মনের খুশিতে গলা ছেড়ে হাসতে থাকেন। মেজদির চেঁচামিচি ও হাসির শব্দে বাচ্চাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং কান্না সুরু হয়। গোয়ালঘর থেকে গরুটাও যেন এই ঘুম-ভাঙানো সোরগোলের সাড়া শুনতে পেয়ে ডাক ছাড়তে থাকে। বাবার খড়মের শব্দ শোনা যায়। শোনা যায়, দিদিমা সুর করে কৃষ্ণনাম গাইতে আরম্ভ করেছেন। সারা রাত্রির উৎসবটা যেন শেষরাত্রির দিকে কিছুক্ষণের মত ঝিমিয়ে পড়েছিল শুধু। আবার সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। দেখা যায় আলোকলতার গায়ে পূব আকাশের আভা এসে লুটিয়ে পড়েছে।

এসব তো বারো বছর আগেকার কথা। আজ এই বাংলোর

বারান্দায় সোফার ওপর বসে মুখ তুলে দেখতে পায় ধীরা, পূবের আকাশ আলোয় ঝলসে উঠেছে। দেখতে পায়, কমলেশের ঠোঁটে সেই তির্যক হাসির রেখা আবার কাঁপছে। ও হাসি একটা দুর্মর সংকল্পের সর্পিল ছায়ার মত। দুঠোঁটের ওপর সামান্য একটু শিহরণ, কিন্তু তার পেছনে একটা কঠিন পর্বত রয়েছে। তারই আকাশস্পর্শী পিপাসা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে এইভাবে। ও হাসি একটা প্রচণ্ড আবেদন। তার মধ্যে শাণিত ছুরিকার মত একটা ইঙ্গিত আছে।

যা শিখিয়েছে কমলেশ, তাই শিখেছে ধীরা। শেখবার চেষ্টায় একটুও ফাঁকি দেয়নি। শিখতে পেরেছেও। ধীরা আজ সত্যই কমলেশের মত মানুষের সহধর্মিণী হতে পেরেছে। দু'জনে জীবনে একসঙ্গে সুখী হবার পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। শুধু এইটুকু এখনো বুঝে উঠতে পারে না ধীরা, আর কতদূর এগিয়ে যেতে হবে।

স্প্যানিয়েলের মাথায় হাত বুলিয়ে কমলেশ জিজ্ঞাসা করে—কি বললেন রাও ?

ধীরা উত্তর দেয়—ভালই বলেছেন।

কমলেশ—রাও লোকটা কি রকম ?

ধীরা—ওয়াণ্ডারফুল মানুষ।

শুনে খুশি হয় কমলেশ, পাইপ মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া টানে আর ছাড়ে, এবং আবার প্রশ্ন করে—কি রকমের ওয়াণ্ডারফুল ?

ধীরা—মিউজিক অত্যন্ত ভালবাসেন। আর টেনিসে তো অসাধারণই বলা যায়। এত নিখুঁত আর পরিষ্কার লেফ্‌ট্ আমি অন্তত আজ পর্যন্ত দেখিনি।

কমলেশ—গিরিডির সেই ললিত দত্তের চেয়েও ভাল হাত ?

ধীরা—পুওর ললিত! রাওয়ের কাছে ললিত ইজ্ এ বেবি!

কমলেশ—চুলোয় যাক্ ললিত। রাও কি বললেন তাই বল?

ধীরা হাসে—বল্‌লাম তো, ভালই বলেছেন।

কমলেশ—তার মানে?

ধীরা—ভাল কথাই বলেছেন।

কমলেশ—আরে, কথাগুলি কি বললেন সেটাই স্পষ্ট করে বলো না?

কমলেশের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়েই অন্য দিকে মুখ ফেরায় ধীরা। সেই বাঁকা হাসি কাঁপছে কমলেশের দু' ঠোঁটের ওপর, যে হাসির অফুরাণ প্রেরণা ধীরার চলা বলা কথা-হাসি ভাষা-ভঙ্গী ও সাজ-পোষাক থেকে নদে জেলার পাড়াগাঁকে একেবারে লুপ্ত ক'রে দিয়েছে। সোসাইটির শোভন ও লোভন এক চমৎকারিণী ভদ্রা হয়ে উঠতে পেরেছে ধীরা, ঐ বাঁকা হাসিরই শাসনে ও শিক্ষায়। ধীরাও তার প্রথম প্রতিজ্ঞার সম্মান রক্ষা করেছে। কমলেশের অনুরোধের বিরুদ্ধে কোন দিন কোন প্রশ্ন তোলেনি। যা বুঝিয়েছে কমলেশ, কোন দ্বিধা না ক'রে বুঝে ফেলেছে ধীরা।

প্রথম প্রথম বুঝতে একটু দেরী অবশ্যই হতো। বিয়ের পর পাটনাতে আসার দু' দিন পরেই বুঝতে পেরেছিল ধীরা, অনেক কিছু বুঝতে হবে এবং শিখতেও একটু দেরি হবে। কিন্তু মনের জোর থাকলে এবং কমলেশের মত স্বামী সহায় থাকলে কতই বা দেরি হবে?

পাটনায় তখন খুব গরম, সন্ধ্যেবেলা বাইরে থেকে ঘুরে এসে ঘরে ঢুকলো কমলেশ। একটা বিখ্যাত পোষাকের দোকানের জিনিস ও দামের ছবিওয়ালা ক্যাটালগ ধীরার সামনে এনে খুলে

ধরে। একটা ছবির ওপর আস্তে আস্তে আঙুলের টোকা দিয়ে কমলেশ প্রশ্ন করে—ঠিক এরকম স্টাইলে সাজ করতে পারবে ?

হঠাৎ প্রশ্নে একটু ঘাবড়ে যায় ধীরা। ক্যাটালগের পাতায় বিচিত্র ভঙ্গিতে শাড়ি-পরা তরুণীর সেই চিত্রিত মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে ধীরা। তারপরেই হেসে ফেলে—পারবো।

কমলেশ—তবে আর দেরি করো না।

ধীরা—এখুনি ?

কমলেশ—হ্যাঁ, এখুনি একজন উঁচুদরের লোক আসবেন। নেমন্তন্ন করে এসেছি, এখানেই চা খাবেন।

ধীরা—সম্পর্কে গুরুজন হ'লে কিন্তু ওরকম সাজ করে তাঁর সামনে আসতে আমার কেমন···।

ঝিক্ করে বাঁকা হাসির একটি স্ফুলিঙ্গ ঝলসে ওঠে কমলেশের ঠোঁটে—গুরুজনের চেয়েও গুরুতর জন। কিন্তু তার জন্যে তোমার কেমন-কেমন করবার কোন দরকার নেই।

মূর্খের মত চোখ ক'রে ধীরা প্রশ্ন করে—গুরুতর জন ?

কমলেশ—হ্যাঁ. এক মোটরকার কোম্পানীর বড় সাহেব।

ধীরার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং তাকায়ও ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। এক বড় সাহেব চা খাবেন, কিন্তু তার জন্যে তাকে এমন একটা ছবির মেয়ের মত সাজ করতে হবে কেন ?

কমলেশ বলে—ঘাবড়াচ্ছ কেন ? আর ঘাবড়ালে তো চলবে না। পৃথিবীতে তোমার ঐ মটরমালার যুগ আর নেই।···যাও তাড়াতাড়ি সেজে ফেল।

আর দ্বিধা করেনি ধীরা এবং ধীরার সাজ দেখে খুশি হয়েছিল কমলেশ। আরও খুশি হয়েছিল, যখন ধীরা হাসিমুখে বড় সাহেবের প্রসারিত হাতে হাত সঁপে দিয়ে অতিশিক্ষিতা গৃহস্বামিনীর

মতই অতিথিকে অভ্যর্থনা জানালো। চা তৈরী ক'রে নিজের হাতেই পরিবেশন করলো। যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিল কমলেশ, অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তেমনটি করে দেখাতে পারলো ধীরা। এমন কি একটা ফুলের তোড়া নিজের হাতে বড় সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে হার্টফেল্ট রিগার্ড জানাবার সময় একটুও হাত কাঁপেনি ধীরার এবং মুখস্থ করা ইংরিজী শব্দ দুটোও কাঁপেনি। বড় সাহেব বিদায় নেবার সময় মুগ্ধভাবে কমলেশকে বললেন—আপনাব স্ত্রী পরীর মত সুন্দর, অথচ কত লাজুক। একটা দুর্লভ জিনিষ দেখবার সৌভাগ্য আজ আমার হলো।

গাড়ীতে উঠবার আগে বড় সাহেব আবার বলেন—আপনার চায়ে মাঝে মাঝে আসতে ইচ্ছে করি।

কমলেশ বলে—রোজ আসবেন, চিরকাল আসবেন।

বড় সাহেব চলে যাবার পর মনের খুশির আবেগে অনেকক্ষণ গল্প করে কমলেশ আর ধীরা। বাইরে থেকে কে যেন ডাকে—কমলেশ? কমলেশ আছিস?

কমলেশ উঠে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং মাত্র দু'চারটা কথার মধ্যেই আলাপ শেষ করে, আগন্তুক লোকটিকে বিদায় দিয়ে ফিরে আসে। ধীরা জিজ্ঞেস করে, কে ডাকছিল?

কমলেশ—পটল।

ধীরা—তিনি তোমার বন্ধু বোধ হয়?

কমলেশ—কলেজে এক ক্লাসে এক সঙ্গে বসে পড়লেই যদি বন্ধু হয়, তবে পটলও আমার বন্ধু।

ধীরা হাসে—অদ্ভুত বন্ধু।

কমলেশ কৌতূহলী হয়—তুমি কি ক'রে বুঝলে ধীরা?

উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করে হাসতে থাকে ধীরা। উত্তর দিতে

পারে, কিন্তু কেমন একটা লজ্জার বাধা এসে যেন মুখ চেপে দিচ্ছে ধীরার।

কমলেশ আবার প্রশ্ন করে—ওকে তোমারও কেন অদ্ভুত মনে হলো?

ধীরা—যাক্‌গে।

কমলেশ—না, বলতেই হবে।

ধীরা বলে—বন্ধু বিয়ে ক'রে ঘরে এসেছে, একথা জেনেও যে একবার ভেতরে না এসে বাইরে থেকেই দু'কথা বলে চলে যায়, সে আবার কেমন বন্ধু?

বাঁকা হাসি ফুটে ওটে কমলেশের ঠোঁটে—গুড গড! উল্টো বুঝলি রাম! তুমি ভয়ানক ভুল বুঝেছ ধীরা। পটল ভেতরে আসতে চেয়েছিল তোমাকেই দেখবার জন্যে। আমিই আপত্তি করে বিদায় করে দিয়েছি।

ধীরা বিষণ্ণভাবে বলে—কি মনে করবেন ভদ্রলোক?

কমলেশ গম্ভীর হয়—পটল কিছু মনে করলেই বা কি এসে যায়?

বুঝতে পারে না, বুঝতে চেষ্টা করে, বুঝতে দেরি হয় ধীরার। বড়সাহেব যেখানে এসে চা খেয়ে যায়, বন্ধু সেখানে এসে চা খেলে কি এমন দোষ হবে?

কমলেশ বলে—পটলা পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানীগিরি করে। ওকে এখানে বসিয়ে চা খাওয়ালে আমার কি লাভ?

ধীরা মুখ খুলে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, কিন্তু মনটা নীরবে জিজ্ঞাসা করে ওঠে—এক বড়সাহেব এসে চা খেয়ে গেলেন, তাতেই বা কি লাভ হলো?

এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল ধীরা ঠিক দুদিন পরেই, এরকমই এক সন্ধ্যেবেলায় এই চেয়ারের ওপর বসে যখন গল্প করছিল ধীরা, কমলেশের সঙ্গে। এক পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল এবং চিঠি

খুলেই হেসে ফেললো কমলেশ। মস্ত বড় এক মোটরকার কোম্পানীর সেই বড়সাহেবের সই করা চিঠি। প্রধান সেলস্‌ম্যানের কাজ পেয়েছে কমলেশ। পাইয়ে দিয়েছেন বড়সাহেব। মাইনে পাঁচশো টাকা, তা ছাড়া কমিশন আছে। কাজ বলতে কিছুই নয়। শুধু শো-রুমে সুসজ্জিত হয়ে বসে থাকা, এবং খরিদ্দার এলে হাসি মুখে করমর্দন করে শুধু সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে এক অভ্যর্থনা করা। বাকি যা কাজ, তা করবার জন্য সাব-অর্ডিনেটরাই আছে।

এইবার বুঝতে পারে ধীরা, কি লাভ হলো এবং কেমন করে হলো। ছবির মেয়ের মত সাজ ক'রে একটি সন্ধ্যায় পরীর মত সুন্দর হওয়ার এই পুরস্কার। এমন যে হতে পারে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ধীরা।

কমলেশ বলে—পটলার মত পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটা গরু হয়ে খেটে খেটে জীবনপাত করবো, এমন বুদ্ধি নিয়ে আমি পৃথিবীতে আসিনি ধীরা। বড়লোকের ছেলে হয়ে জন্মেছি, বড়লোকের ছেলের মতই সব খুইয়েছি। আবার দু'হাতে টাকা আনবো আর দু'হাতে খরচ করবো। এই তো মাত্র সুরু। কিন্তু…কিন্তু তোমাকে শুধু মনে প্রাণে আমার মনের মত হয়ে…।

ধীরা কৃতার্থভাবে বলে—বিশ্বাস কর, আমি প্রাণ দিয়েও তোমার…।

কথা শেষ করে না ধীরা, হঠাৎ কি যেন আশা ক'রে মুগ্ধ লোভীর মত তাকিয়ে থাকে কমলেশের মুখের দিকে।

ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে ধীরার হাত ধ'রে বিলিতী ভঙ্গিতে ঝাকুনি দেয়-কমলেশ—থ্যাঙ্ক ইউ ধীরা।

মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরা, যেন হঠাৎ পায়ে একটা কাঁটা বিঁধেছে। নিজেরই ওপর রাগ হয় ধীরার।

পরের দিনই এ বাড়ি ছেড়ে দানাপুরে একটা দু'শো টাকার ভাড়া বাড়িতে উঠে যায় কমলেশ আর ধীরা। একজন বাবুর্চি আর দু'জন চাকর এসে কমলেশের নতুন গৃহস্থালীর কাজের ভার নেয়। নতুন ফার্নিচার কেনা হয়, চারটে বড় বড় ঘর চার রকম ক'রে সাজানো হয়। মিস্ ডিসিলভা আসেন ধীরার শিক্ষয়িত্রী হয়ে, মাসিক একশো টাকার মাইনেতে। লেখাপড়া শেখানো ছাড়া, কিছু টেনিস ও মিউজিক এবং কিছু কিছু পোলকা সুইং আর বুগি-উগিও শেখাবেন তিনি।

অফিস থেকে গাড়ি আসে, নিখুত ও পরিপাটি সাহেবী সাজে বের হয়ে যায় কমলেশ। বড় জোর ঘণ্টা দুই মোটরকার কোম্পানীর শো-রুমের অফিসে বসে থাকে, তার পরেই বাড়ি ফিরে আসে। ক্লান্ত হতে, হাঁপাতে অথবা এক মুহূর্তের জন্য ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতে পারে পারে না, চায় না, জানেও না কমলেশ। একান্তভাবেই বুদ্ধির মানুষ কমলেশ, খাটুনি নামে একটা দরিদ্রসুলভ বিকার তার আচরণে একেবারেই নেই। কারও কপালে ঘাম দেখলেই মানুষটাকে কেমন ছোটলোক ছোটলোক মনে হয় কমলেশের।

বাড়ির চাকর ছুটোছুটি ক'রে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটে। ধীরার খাটুনিই বা কম কি? মিস ডিসিলভার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে এবং সে শিক্ষা ঝালিয়ে রাখতে সকাল-সন্ধ্যার অন্তত সাতটা ঘণ্টা সময় কেটে যায় ধীরার। শুধু কমলেশের হাত-পা এই জগৎব্যাপী কাজের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যেন সুস্থির হয়ে রয়েছে। ডিটেকটিভ নভেল হাতে নিয়ে বারান্দায় সোফার ওপর অচঞ্চলভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার ক'রে দেয় কমলেশ।

বিকেল হলে সামনের মাঠে এক একদিন মিস ডিসিলভার সঙ্গে টেনিস খেলে ধীরা। ডিটেকটিভ নভেল বন্ধ ক'রে কমলেশ এক একবার তাকিয়ে দেখে, কিন্তু দেখেও তার হাত-পায়ের পেশী

ও ধমনীতে কোন সাড়া জাগে না। এসব বিষয়ে যোগিসুলভ একটা বিরাট নিঃস্পৃহা ও ঔদাসীন্য আছে কমলেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই। শরীরটাকে অকারণে খাটিয়ে ক্লান্ত করার এই বি ব্যাধির জন্য মনে কোন আগ্রহ হবে, এমন জিনিষ দিয়ে তৈরিই নয় কমলেশের মন।

অথচ মনটা ছোট নয় কমলেশের। জীবনটাকে মস্ত বড় করে পাওয়ার জন্য বিরাট একটা তৃষ্ণা ছড়িয়ে আছে সে মনে। কিন্তু তৃষ্ণা মেটাবার জন্য চৈত্র মাসের পাহাড়ী ভেড়ার মত রোদ্দুরে দু'ক্রোশ পথ হাঁটতে রাজি নয় কমলেশ, দু'চুমুক ঝর্ণার জল খেতে পাবে বলে। ওসব কি সুখের জীবন এবং ওধরণের জীবনে কি সুখ থাকে? অনেক ভেবে দেখেছে কমলেশ, পৃথিবীর মতিগতি ধরণ-ধারণ ও রকম-সকম খুব ভাল করে বুঝে নিয়ে সে তার পথ ঠিক ক'রে ফেলেছে। হাত বাড়িয়ে এই আলমারির কপাট খুলে ফেললেই হাতের কাছে সবচেয়ে দামী স্প্যানিশ মদের বোতল চলে আসবে চিরকাল, এমন সুখের জীবন কি সম্ভব নয়? কমলেশ বিশ্বাস করে, খুবই সম্ভব।

সন্ধ্যে হলেই বড়সাহেব যখন আসেন, তখন ধীরাই এসে আলমারির কপাট খোলে এবং নিজের হাতেই স্প্যানিশ মদে মদির দুটি কাচের গেলাশ বড়সাহেব ও কমলেশের হাতে তুলে দেয়।

বিয়ের এক বছর আগেও কমলেশের স্বর্গত পিতার একমাত্র জীবিত বন্ধু এটর্ণি মজুমদার মশাই বলেছিলেন, কমল, আর কতদিন এভাবে বসে থাকবে! বরং আমি বলি...।

—বলুন।

—তুমি বছর দুই জাপানে থেকে সিল্ক রং করার কাজটা শিখে এস। যদি বেশ মন দিয়ে এবং খেটেখুটে কাজটা কোন মতে শিখে আসতে পার, তবে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কি হবে ?

—বেনারসে একটা নতুন সিল্ক ফ্যাক্টরী করেছে আমাদের কিষেণলাল। অন্তত শ' তিনেক টাকা মাইনেতে সেখানে তোমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারবো।

—আমি রাজি আছি জেঠামশাই। কিন্তু জাপানে যাবার আর থাকবার খরচ ?

—আমি দিচ্ছি। হিসেব করে দেখেছি, পাঁচ হাজার টাকা হলেই হয়ে যাবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একরকম হয়ে যাবে। আমি তাহলে এ মাসেই...।

মজুমদার মশাইয়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা সেদিনই নিয়ে চলে আসে কমলেশ।

দু' বছর খেটে কাজ শেখার পর কিষেণলালের সিল্ক ফ্যাক্টরীতে তিন শো টাকা মাইনের রংমাস্টারের চাকরি, একটা আস্ত গাধার জীবন! জাপান যায়নি কমলেশ। মজুমদার জেঠামশাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একদিন ছুটে এলেন এবং দাবি করলেন—তাহলে আমার টাকা ফেরত দাও।

কমলেশ ইংরেজী ভাষায় অতি শান্তভাবে যে কথা বলে, তার অর্থ হলো, আপনার কাছ থেকে জীবনে কখনো কোন টাকা-পয়সা আমি নিইনি, সুতরাং আপনাকে টাকা ফেরত দেবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

মজুমদার জেঠামশাই আর একটি প্রশ্নও না উঠিয়ে সোজা চলে গেলেন। কমলেশ গেল দার্জিলিং।

চার মাস দার্জিলিং-এ কাটিয়ে আবার পাটনায় ফিরে এল কমলেশ। পাঁচ হাজার টাকার তখন অবশিষ্ট পাঁচ ছয় আনা মাত্র ছিল। আবার টাকার স্বপ্ন মনের ভেতর ছটফট করতে থাকে,

তৃষ্ণার্ত পাখি যেমন পাখা ঝাপটিয়ে ছটফট ক'রে মরা নদীর বালু খুঁড়তে থাকে ঠোঁট দিয়ে।

সেদিনই খবর পেল কমলেশ, সেই মোটরকার কোম্পানীর জন্য প্রধান সেলসম্যান চাই। মাইনে পাঁচশো এবং কমিশনও গড়ে মাসিক হাজার টাকার ওপরেই হয়ে থাকে। কাজটা কমলেশের মনের মতই কাজ, কারণ কাজ বলে কিছুই নেই। শুধু শো-রুমের অফিসে অত্যন্ত সৌখিন পোষাকে সেজে স্মার্ট হয়ে বসে থাকা। কোন্ এক গভর্ণরের ভাইপো এ কাজটা বাগাবার জন্যে ভয়ঙ্কর রকমের চেষ্টা করছে।

দরখাস্ত করলো কমলেশ আর ভাবলো। একদিন, দুদিন, তিন দিনের ভাবনার পরেই কমলেশ সিটিতে গিয়ে এক গলির মধ্যে একটা জীর্ণ বাড়ির জানালার মাথায় লটকানো সাইনবোর্ডটার দিকে তাকালো। তারপরেই ঘরের ভেতর ঢুকে ভাঙা তক্তপোষটার উপর উপবিষ্ট ঘটক ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললো,—পাত্রী চাই, নিতান্ত গরীব ঘরের হলেই চলবে।

ঘটক—পাত্র ?

কমলেশ—আমি।

ঘটক—আপনার পরিচয় ?

কমলেশ—আমি লেট রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র রায় এটর্ণির ছেলে।

ঘটক ঠাকুর উৎসাহিত হয়ে এবং সশ্রদ্ধভাবে বলেন—আপনি মহৎ, আপনি মহৎ। আপনার পিতাও এই রকমই মহৎ ছিলেন। তিনি আমার উপকারী এবং আমি তাঁর কাছে ঋণী।

কমলেশ—পাত্রী কিন্তু বেশ সুন্দরী হওয়া চাই। মুখ্খু হ'লেও চলবে। এমন পাত্রীর খোঁজ আছে ?

ঘটক—আছে, অসামান্যা সুন্দরী পাত্রী আছে।

কমলেশ—কোথায় ?

ঘটক—নদে জেলার এক পাড়াগাঁয়ের স্কুল মাষ্টারের মেয়ে।

• কমলেশ বলে—ব্যবস্থা করে ফেলুন। `

এসবই তো সেই বারো বছর আগেকার ঘটনা। সে ঘটনাকে অনেক পেছনে ফেলে রেখে কমলেশ আজ এসে পৌঁছেছে বরাকরের কিনারায় এই সুন্দর বাংলোর পালিশ করা বারান্দায়। কিন্তু এখানেই সে চিরকালের মত থেকে যাবার জন্য আসেনি। জীবনটাকে যেমন ক'রে পেলে সুখী হবে কমলেশ, তেমন ক'রে এখনো পাওয়া হয়নি। বরং অনেক ধার হয়েছে, পাওনাদারেরা আশেপাশে ঘুরছে এবং কমলেশের এক কথাতেই আজকাল আর তেমন ক'রে নমস্কার জানিয়ে চলে যায় না। বরং বলে যায়, কাল আসবো এবং সব পাওনা পাই-পাই মিটিয়ে দিতে হবে।

এভাবে আর কতদিন ? রাও কি বলেছেন, সেটা স্পষ্ট করে জানতে পারলেই বুঝতে পারবে কমলেশ, এখানে আর কতদিন! কিন্তু ধীরাকে কেমন যেন আনমনা দেখাচ্ছে। সোজা সরল প্রশ্নটার উত্তর দিতে অকারণে কত দেরি করছে।

সকাল বেলার আকাশে অন্য দিনের তুলনায় কিছু অভিনব রঙ বা রূপের দৃশ্য ছিল না, তবু আকাশের দিকেই তাকিয়েছিল ধীরা। চোখের ওপর আকাশের আভা এসে পড়েছে, যেন চক্‌চক্‌ করছে দুটি পাথরের চোখ। মনে হয় প্লাষ্টার দিয়ে তৈরি সুন্দর এক নারীমূর্ত্তির মডেলকে ঘাসী রঙের সিল্কের সাড়ি দিয়ে আর দুটি হীরার কানফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে ধীরা। কমলেশ বলে—কি হলো ?

ধীরা—রাও রান্নাতেও হাত পাকিয়েছেন ভাল। নিজের হাতেই

পনর মিনিটের মধ্যে পরিজ তৈরি করে এনে বললেন, খান মিসেস রায়।

কমলেশ—খেলেই পারতে।

ধীরা—খেয়েছি বৈকি।

কমলেশ—তারপর?

সেই প্রশ্ন, তার সঙ্গে তুমর সেই বাঁকা হাসি কমলেশের ঠোঁটে নিঃশব্দে কাঁপছে। আজ পর্যন্ত ঐ হাসি ধীরাকে কোন প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে দেয়নি। কোন রকমে অবাধ্য হতে দেয়নি। কোন কথা বুঝতে ও বিশ্বাস করতে দেরি হলে কমলেশের এই হাসির ইঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে সেকথা বুঝেছে ও বিশ্বাস ক'রে ফেলেছে ধীরা। কিন্তু আজ যেন মনের সব শক্তি দিয়ে কমলেশের প্রশ্নকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে ধীরা। বোধহয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না ধীরা, ইচ্ছেই করছে না; ভয় পাচ্ছে ধীরা।

ধীরা বলে—রাও একটি গুণের জাহাজ। গার্ডেনিং জানেন এক্স-পার্ট মালীর চেয়েও ভাল। নিজের হাতে যত্ন ক'রে সুন্দর সুন্দর কত ম্যাগ্নোলিয়া ফুটিয়েছেন। দেখে সত্যিই আশ্চর্য লাগলো। সারা দিন ধরে খনি কারখানা আর অফিস করেও কেমন করে যে এত সব সখের কাজ করবার সময় পান এবং করতে পারেন, আশ্চর্য!

কমলেশ—আমার কাজটার কি ব্যবস্থা করলেন? কিছু প্রমিস করলেন?

কমলেশের গলার স্বরে একটা তীব্রতার সুর ফুটে ওঠে, কারণ আশা-ভরসা ও কৌতূহলে তীব্র হয়ে রয়েছে কমলেশের মন। ধীরা সব বুঝেও অবুঝের মত যত অবান্তর বিষয় নিয়ে গল্প জমাতে চাইছে। ধীরার গল্প, আর গল্পের এই উচ্ছল হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গি, দুই-ই দুঃসহ হয়ে উঠছিল কমলেশের কাছে।

আগাবেগ ব্রাদার্সের প্রধান সেলিং এজেন্ট হবার ইচ্ছা জানিয়ে

দরখাস্ত করেছে কমলেশ। এ কাজটাও বসে থাকার কাজ। দেশ-বিদেশের অর্ডার আসে এবং আগাবেগ ব্রাদার্সের অভ্রের স্তূপ আপনা থেকেই নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়। এর জন্যে সেলিং এজেণ্টের তেমন কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খবর পেয়েছে কমলেশ, মাত্র আড়াই পার্সেণ্ট কমিশনে কোন্ এক মিনিস্টারের বোন-পো সেলিং এজেণ্ট হয়ে বসবার চেষ্টা করছে। মাত্র আড়াই পার্সেণ্ট, কিন্তু তারই হিসাবের জোরে মাসে সাত আট হাজার টাকা কমিশন হবে মিনিস্টারের বোন-পোর। সন্ধ্যেবেলা শুধু অফিস ঘরে এসে একটি চালান বই ও একটি রেজিস্টার সই-করা, এছাড়া একাজে আর কোন খাটনি হয়রানি নেই। কমলেশ তার দরখাস্তে দাবি করেছে, সাড়ে তিন পার্সেণ্ট কমিশনে তাকে সেলিং এজেণ্ট নিযুক্ত করা হোক। সবই তো রাওয়ের হাতে; ইচ্ছে করলে তিনি সবই করতে পারেন।

কিন্তু ইচ্ছে না করার সাধ্যি হবে কি রাওয়ের? এ বিশ্বাস আছে কমলেশের, ধীরা যখন ভার নিয়েছে, তখন রাওকে ইচ্ছে করিয়ে ছাড়বেই। সে শক্তি ধীরার আছে। কই, আজ বারো বছরের মধ্যে কোন ঘটনায় ধীরাকে তো কখনো হার মানতে ও ব্যর্থ হতে হয়নি।

পাটনার সেই মোটরকার কোম্পানীর শো-রুম উঠে যাবার পর অর্থাৎ কমলেশের এত বড় আকাঙ্ক্ষা অথচ অর্থকর চাকরিটা চলে যাবার পর দানাপুরের সেই দু'শো টাকার ভাড়ার বাড়ীতেই আরও এক বছর দু'জনে এক রকমের সুখেই ছিল। চাকরি ছিল না কমলেশের, কিন্তু টাকার অভাব হয়নি। কারণ, এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার একদিন কমলেশের আমন্ত্রণে চা খেতে এলেন। প্রথম দিন ধীরার হাতের চা খেলেন এবং দ্বিতীয় দিন ধীরার হাতের পিয়ানো শুনলেন ম্যানেজার। তৃতীয় দিন কমলেশেরই ভাড়া-করা ট্যাক্সীতে

চড়ে আনন্দ-ভ্রমণ করে এলেন নালন্দা পর্যন্ত। ট্যাক্সির সীটে একপাশে বসলেন ম্যানেজার, একপাশে কমলেশ, মধ্যে ধীরা।

তার পরেই একদিন দশ হাজার টাকার লোন চেয়ে একটা চিঠি দিল ধীরা, এবং ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পত্রপাঠ চেক পাঠিয়ে দিলেন। সে লোন হয়তো এখনো ব্যাঙ্কের অনর্থকের খাতায় মাত্র একটা লেখা হয়ে পড়ে আছে। কিংবা এতদিনে মুছেই গিয়েছে, কারণ এটাও তো প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা।

জব্বলপুরের কাছে একটা সাহেবী হোটেলে প্রায় এক বছরের জীবন। সেও তো তিন বছর আগেকার কথা। হোটেলের বিল মাসের পর মাস শুধু জমে উঠতেই থাকে। শোধ করতে পারে না কমলেশ। হোটেলের মাতাল মালিক পাঁচ হাজার টাকার একটি বিল এবং একটি শেষ নোটিশ নিয়ে এসে কমলেশ আর ধীরার ঘরে ঢুকলেন :—যতদূর সাধ্য আমরা ধৈর্য ধরে আপনাকে সহ্য করেছি মিস্টার রায়। কিন্তু এই শেষ। আজ পেমেণ্ট চাই।

ধীরার মুখের দিকে তাকায় কমলেশ। ফোটা ফুলের মত ফুল্ল-রুচি মুখের ওপর রঙীন হাসির পরাগ ছড়িয়ে ধীরা বলে—মিষ্টার প্রোপ্রাইটর!

প্রোপ্রাইটর—বলুন, কি বলবার আছে ?

ধীরা—বিল শোধ করার ভার আমি নিলাম।

প্রোপ্রাইটর—নিন।

ধীরা—আজ নয়. মাত্র আর সাত দিন পরে। পুণা থেকে ঘুরে আসি, তার পর।

প্রোপ্রাইটর—কেন .

ধীরা—টাকা আনতে যাব আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে আমারই পাওনা টাকা।

প্রোপ্রাইটর—আজ তাহ'লে আপনি একেবারে টাকাশূন্য ?

ধীরা—হ্যাঁ মিষ্টার প্রোপ্রাইটর, এখানে এসে জুয়েলারী কিনতে আমার পনর হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে।

যা শিখিয়ে দিয়েছিল কমলেশ, তাই স্বচ্ছন্দে বলে গেল ধীরা। একটি কথার মধ্যেও গলার স্বর আট্‌কে গিয়ে কেঁপে উঠলো না, যত মিথ্যে হোক না কেন সে-কথা। বরং ধীরার চোখ আর মুখের হাসির ছোঁয়া লেগে মিথ্যে কথাগুলি জীবন্ত সত্যের চেয়েও বেশি বিশ্বাস্য হয়ে বেজে ওঠে।

কিন্তু মাথা নাড়লেন প্রোপ্রাইটর। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকেন, তারপর ধীরার মুখের দিকে অপলক চোখে তীব্রভাবে তাকিয়ে থাকেন। তারপরেই হো-হো করে হেসে উঠে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় আশ্বাস দিয়ে বলেন—তাতে চিন্তা করবার কি আছে? আপনিই তো একটি জুয়েল, ম্যাডাম!

ধীরা হাসে। প্রোপ্রাইটর উৎসাহিত হয়ে বলেন—বিল আর পেমেন্টের কথা এখন থাক। আসুন, নাচের ঘরে যাই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রোপ্রাইটর এবং ধীরার হাতের দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে আহ্বান জানায়।

বুক কেঁপে ওঠে ধীরার। ফোটা ফুলের মত সুন্দর মুখের ওপর আগুনের একটা হল্‌কা এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে, রঙীন হাসির পরাগ মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে কালো হয়ে যায়। ভীরু ও[illegible]র অসহায়ের মত বেদনাক্ত দৃষ্টি তুলে কমলেশের দিকে তাকায় ধীরা।

কমলেশ তাকায় ধীরার চোখের দিকে। ভ্রূকুটি নয়, ছ'চোখে ব্যথিত পুরুষহিংসার বিদ্যুৎ নয়, কমলেশের ছু' ঠোঁটে ধীরে ধীরে সেই তির্যক হাসির রেখা ফুটে উঠে নিঃশব্দে কাঁপতে থাকে। দ্বিধা করলে বা ভয় করলে চলবে না ধীরার। নির্ভীক কালচার্ড নারীর মত ধীরাকে অগ্নিপরীক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে হবে হাসতে হাসতে। ঐ বাঁকা হাসি হলো তারই অমোঘ নির্দেশ। মিস

ডিসিল্‌ভার কাছে নাচের এত ভাল ভাল স্টেপ আর সুইং এত কষ্ট করে শিখেছে ধীরা, সেগুলিকে কাজে লাগাবার এই সুযোগ বৃথা হতে দেওয়া চলবে না। ধীরার ঐ সুঠাম দেহের তুচ্ছ কয়েকটা হিন্দোলিত ভঙ্গির স্পর্শসুখে অভিভূত হয়ে প্রোপ্রাইটার যদি পাঁচ হাজার টাকার বিল কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তবে আর দ্বিধা করবার কি আছে ধীরার? এ সব দ্বিধা-কুণ্ঠার সংস্কারকে ধীরার মন থেকে কবেই তো নিঃশেষে দূর করে দিয়েছে কমলেশ।

আশ্চর্য হয় এবং মনে মনে বিরক্ত হয় কমলেশ। এত শেখাবার পরেও ধীরার মুখের ওপর যেন মাঝে মাঝে হঠাৎ এক মূর্খ পাড়া-গাঁয়ের ছায়া ভেসে ওঠে। তখন এই নীরব বাঁকা হাসির শাসন ছাড়া ধীরাকে বোঝাবার আর কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় ন' বছর পার হবার পরেও, আজও দেখতে পায় কমলেশ, ধীরার অন্তরাত্মার ভেতর লুকানো দুর্বল ও অসহায় একটা বিদ্রোহ যেন আবার মাথা তুলতে চাইছে। বাঁকা হাসির কাঁপুনি দেখেও যেন ভয় পাচ্ছে না ধীরা। প্রোপ্রাইটারের আহ্বান যেন শুনতে পাচ্ছে না।

মুখ ফিরিয়ে আলোর দিকে অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে থাকে ধীরা। চোখ দুটো পোখরাজ পাথরের মত ঝক্‌ঝক্ করে। তার পরেই বলে—রসিদ দিন মিষ্টার প্রোপ্রাইটার, আমি এখুনি বিল শোধ করে দিচ্ছি।

প্রোপ্রাইটার বিস্মিত হয়ে পকেট থেকে রসিদ-বই বের করেন এবং রসিদ লিখে ধীরার হাতের কাছে এগিয়ে দেন।

গলা থেকে জড়োয়া নেকলেস খুলে নিয়ে প্রোপ্রাইটারের হাতের কাছে তুলে ধরে ধীরা—এই নিন, এর দাম পাঁচ হাজার টাকার কিছু বেশিই হবে।

প্রোপ্রাইটার চমকে উঠে বলেন—বুঝলাম। তারপরেই গম্ভীর

হয়ে বলেন—আমি আপনাকে বিশ্বাস করলাম ম্যাডাম। যান, পুণা চলে যান, কিংবা যেখানে খুশি যান। যেদিন পারবেন টাকা পাঠিয়ে দেবেন। গুড বাই!

ধীরার জড়োয়া নেকলেসের দিকে আর একটা ভ্রূক্ষেপও না করে চলে গেলেন প্রোপ্রাইটার। কমলেশের বাঁকা হাসির কাঁপুনি থামে এবং ধীরার কৃতিত্ব দেখে শেষ পর্যন্ত সুখীই হয় কমলেশ, যদিও সে জানে যে, এধরণের উদারতার অভিনয় সব সময় নিরাপদ নয়। টাকা আনবার ও বাঁচাবার ব্যাপারে এই ধরনের চেষ্টার পথ ঠিক পাকা সড়ক নয়, কাঁচা রাস্তা। তার মধ্যে গেঁয়ো কাদা মিশে রয়েছে, পিছলে যাবার ভয় আছে। যাই হোক…।

কিন্তু সারা রাত নিঃশব্দে বালিশের ওপর শুধু মুখ গুঁজে পড়ে থাকে ধীরা, ঘুমোতে পারে না। এ পথ কোন্ পথ? ধীরার ভাগ্য দেখে এবং ভাগ্যের নতুন নতুন উন্নতির সংবাদ শুনে সুখী হয়ে আছে নদে জেলার এক পাড়া-গাঁ। কিন্তু তারা কি জানে, ধীরার হৃৎপিণ্ড যে দিবারাত্রি পুড়ছে?

মাঝরাতে নিশির ডাকে জেগে-ওঠা মানুষের মত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে ধীরা। আলো জ্বেলে টেবিলের কাছে বসে। কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে থাকে।

মেজদি, জামাইবাবু তো বত্রিশ টাকা মাইনে পান শুনেছি। কিন্তু তোমাকে তো একদিনের জন্যও একটুও লজ্জা পেতে দেখলাম না।

এক গাদা ছেলে-পিলে নিয়ে ছেঁড়া তোষকের ওপর পড়ে থেকে আর কতগুলি চাল-ডাল সেদ্ধ করে দিন কাটাও কেমন করে? ধন্যি তোমাদের সুখ!

এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয় ধীরা।

নতুন করে আর একটা চিঠি লেখে।—কিছু মনে করো না

মেজদি, একটা কথা জানতে চাই, সত্যি কি না? দিদিমার কাছে শুনেছি, তোমার বিয়ের মাত্র এক মাস পরেই জামাইবাবু নাকি তোমাকে চাবুক তুলে মারতে তাড়া করেছিলেন, কারণ তুমি নাকি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপর একটা ফেরিওয়ালার দিকে হাঁ করে বেহায়ার মত তাকিয়েছিলে? আমি জানতে চাই, তুমি কি সত্যি সত্যিই এরকম একটা লোককে ভদ্রলোক মনে করো? বত্রিশ টাকা মাইনের মুহুরী, সেই মানুষটাকে কি সত্যিই স্বামী বলে ভেবে সুখ পাও? ভালবাসতে পেরেছ কি? আমার সন্দেহ হয় মেজদি।

চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয় ধীরা। দু' হাতে কপাল চেপে বসে থাকে। কপালের শিরাগুলি দপ দপ করে, যতক্ষণ না হোটেলের রাত্রি ভোর হয়।

জব্বলপুরের পর কিছুদিন জামসেদপুর, তারপর গিরিডি—কত রাত্রিই তো ভোর হয়ে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় ধনী ও কালচার্ডের সমাগমে গম্‌গম্‌ করেছে কমলেশের ভাড়া-করা বাংলোর লন আর বারান্দা। ধীরার শাড়ির আঁচলের বাতাসে, ধীরার হাতে তৈরী চায়ের মিষ্টি উত্তাপে, ধীরার সুস্মিত ওষ্ঠের ভঙ্গিতে, পিয়ানোর স্বর-তরঙ্গের মত ধীরার উচ্ছল হাসির শব্দে—তার ওপর ধীরার ভাব-নিবিড় কণ্ঠস্বরে ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু কবিতার আবৃত্তিতে সান্ধ্য আসরের জনতা সংজ্ঞা না হারাক, সময়জ্ঞান হারিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ধীরাই যখন ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত না করে আর পারে না, তখন গাড়ির ড্রাইভারদের ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে বাড়ি ফিরেছে সবাই। যে সন্ধ্যায় যার পাশে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে সবচেয়ে বেশিক্ষণ গল্প করেছে ধীরা, পরের দিন তারই কাছে কমলেশের বেয়ারা গেছে চিঠি নিয়ে। অন্তত হাজার দুই টাকা ইন ক্যাশ এখুনি চাই।

এসেছে টাকা। কমলেশের চিঠির দাবি প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে, এমন কোন শক্তিমান কাউকে দেখা যায়নি। বরং দেখা

গেছে, কেউ কেউ যেন একটা আশার উন্মাদনায় দু' হাজারের বদলে তিন হাজার পাঠিয়ে দিয়েছে। কমলেশের টাকার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

গিরিডি ছেড়ে চলে যাবার মাসখানেক আগে যেদিন কলিয়ারী অঞ্চলের সেই নানা জাতেরবড়লোকদের ক্লাবে টেনিস খেললো ধীরা, সেদিন ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে দর্শক হয়ে কমলেশও খেলা দেখেছিল বেতের চেয়ারে বসে। লীলাচঞ্চল লঘু হরিণীর মত ধীরা যখন তার তনুশোভা আবর্তিত ক'রে আকাশে বাহুবিক্ষেপ করে, মাথার ওপর দিয়ে পলাতক বলটাকে ব্যাটের সজোর আঘাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য, দর্শকের চোখে তখন পলক আর পড়ে না। একমাত্র কমলেশের চোখে কোন বিকার দেখা যায় না, বরং দৃষ্টি ঘুরিয়ে সে দেখতে থাকে, কার দৃষ্টি কতখানি পাগল হলো? দেখে খুশি হয় কমলেশ। পাগলের মত ঐ এক একটা দৃষ্টির কাছ থেকে কত টাকা আদায় করা যাবে, অনুমানে তার একটা হিসেবও করে ফেলে কমলেশ।

অনুমান মিথ্যে হয়নি, হিসেবেও ভুল হয়নি কমলেশের। টাকা পেয়েছিল কমলেশ এবং গিরিডির জীবনটা একরকম ভালই কেটেছিল।

কিন্তু সে ভালর চেয়ে আরও ভাল কি হয় না. হয় বৈকি; এবং ইচ্ছে করলে ও বুদ্ধি থাকলে আরও ভালকে সব সময়ই বাগিয়ে ফেলা যায়। এই বিশ্বাসটাই কমলেশের জীবনের আসল নেশা, দামী স্প্যানিশ মদ তো তার জিভের নেশা মাত্র। এবং ঐ আরও ভাল করে পাওয়ার নেশাটকু আছে বলেই মনটা তার দিন দিন আরও শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। গিরিডিতে থাকতেই বুঝতে পারে কমলেশ, আপাতত অন্তত একটা বাড়ি, দুটো গাড়ী এবং হাতের কাছে অন্তত লাখ পাঁচেক নগদ টাকার ছোট্ট একটা স্তূপ না থাকলে

এ জীবনটাই সব নেশা হারিয়ে কি যে হয়ে যাবে বলা যায় না, হয়তো পটলার মত গরুর জীবন হয়ে যাবে।

কলিয়ারীর ক্লাবেই রাওয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা, আলাপ ও পরিচয় হয়েছিল কমলেশের। তার কিছুদিন পরেই গিরিডির কয়লাকে পিছনে ফেলে অভ্র-ছড়ানো এই টাকার দেশে চলে এসেছে কমলেশ আর ধীরা। এই ভাবেই ইচ্ছে থাকলে ও বুদ্ধি থাকলে এবং ধীরার মত একটা...

কি বলা যায়? কমলেশের কে হয় ধীরা? কি সম্পর্ক? কালচার্ড কমলেশের মত মানুষেরও চিন্তার ভাষা হঠাৎ আটকে যায়। মনটা যেন চলতে চলতে এবং এগুতে এগুতে হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায়।

সবচেয়ে দামী স্প্যানিশ মদ কয়েক চুমুক পান করার পর কমলেশের মন আবার মত্ত হয়ে চলতে থাকে। বুঝতে পারে কমলেশ, ধীরা হলো একটা আত্মাহীন মেয়েমানুষের সুন্দর মুখ মাত্র। বেশি কিছু নয়। দশ হাজার টাকার একটা চেক আনতে গিয়ে ঐ মুখে যদি একটা কালো দাগ পড়ে, কি তাতে এসে যায়? বিশ্বাস করে কমলেশ, এই রকম একটা বস্তু তার হাতের মুঠোয় থাকলে এই অভ্রছড়ানো দেশ ছেড়ে আরও এগিয়ে একদিন এক হীরে-ছড়ানো দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারা যাবে।

এ তো হলো ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এখন কি হবে? কতদূর কি হয়েছে? রাওয়ের কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পেরেছে কি ধীরা?

বরাকরের বুকের বাতাস হু হু করে ছুটে আসে। স্প্যানিয়েল আনন্দে মাথা নেড়ে কান বাজায় এবং কমলেশের পাইপের কালো ধোঁয়া চূর্ণ হয়ে সকালবেলার এই উজ্জ্বলতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে

মিলিয়ে যায়। কিন্তু তার ঠোঁটের ওপর বাঁকা হাসির রেখা মিলিয়ে যায় না, বরং আরও কঠিন হয়ে আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে। ধীরার দিকে তাকিয়ে সন্দেহ হয়েছে কমলেশের, আত্মাহীন মেয়েমানুষের সুন্দর মুখটা যেন থেকে থেকে ছট্‌ফট্‌ করছে। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফাঁকা হাসি আর বাজে কথার ঝঙ্কারে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে। কমলেশকে কি একটা আকাট গোখরো মনে করে ধীরা? নইলে কতকগুলি ছল-কথা আর মেকি হাসির বাঁশি বাজিয়ে কমলেশকে ভোলাবার চেষ্টা করে কেন? ভাবতে গিয়ে মনে মনে হেসে ফেলে কমলেশ। ছলনার এ বাঁশি বাজাবার আর্ট যে শিল্পীর কাছে ছাত্রী হয়ে শিখেছে ধীরা, সে শিল্পীরই তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটোকে ধোঁকা দেবার সাহস দেখাচ্ছে ধীরা, আশ্চর্য!

মিথ্যে নয়, সত্যিই আজ সাহস দেখাচ্ছে ধীরা। কে জানে কোন্‌ সাহসে। হয়তো আজকের সকালবেলার রোদের আলো থেকে, কিংবা বরাকরের বুকের বাতাস থেকে হঠাৎ সাহস পেয়ে ধীরা যেন কেমন হয়ে উঠেছে। তার আত্মাহীন জীবনে, মেকি হাসি দিয়ে গড়া এই মুখেও যে কথা ভুলেও কখনো উচ্চারণ করেনি ধীরা, আজ তাই সে অবাধে করে চলেছে। এক পরপুরুষের প্রশংসা। রূপে গুণে কাজে ও শিক্ষায় রাও কত উচুদরের মানুষ! থেকে থেকে যেন ভক্তের উচ্ছ্বসিত আবেগে এক অত্যুচ্চ পৌরুষের উদ্দেশে স্তুতিধ্বনি করে উঠছে ধীরা।

এক বর্ণও মিথ্যে কথা বলছে না ধীরা। রাওয়ের নামে যা যা বলেছে ধীরা, তার সবই সত্য। তবে হাসির ঝঙ্কারগুলি বেজে উঠেই হঠাৎ থেমে যায় কেন? কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয় কেন ধীরা? চোখ দুটো হঠাৎ পাথরের চোখের মত হয়ে যায় কেন? কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে ভুল ক'রে চোখের পাতা মোছে কেন ধীরা?

তবু ধীরাকে আজ বেশ একটু কঠিন দেখাচ্ছে। এই তির্যক হাসির রেখাকে চিরকাল যে ভয় করে এসেছে ধীরা, সে ভয়কে তুচ্ছ করার জন্য যেন প্রস্তুত হয়েছে। এতদিন পরে এবং এত হঠাৎ। আত্মাহীন মেয়েমানুষের আচরণ আজ বড় অস্বাভাবিক মনে হয়।

রাওয়ের নামে স্তুতিধ্বনি! বুকের ভেতর একটা জ্বালার কুণ্ড থেকে কথাগুলি যেন উঠে আসছে, এক একটা উত্তপ্ত সূচীমুখ অঙ্কুশের মত। এ অঙ্কুশ নিক্ষেপ ক'রে ধীরা যেন পরীক্ষা করে দেখছে, সম্মুখের ঐ বজ্রপাষাণের হৃদয় বিদ্ধ হয় কি না। রাগ করে কি না, চিৎকার ক'রে ওঠে কি না, হিংসার জ্বালা লাগে কি না মনে।

কিন্তু তু'চোখ তুলে তাকিয়ে স্পষ্ট ক'রেই দেখতে পায় ধীরা, কমলেশের ঠোঁট তুটি নীরবে বাঁকা হাসি হাসছে।

সে হাসি দেখতে পেয়ে ধীরার মুখের হাসিও যেন দাউ দাউ করে জ্বলে জ্বলে কাঁপতে থাকে। ধীরা বলে—যাই বল, রাওয়ের চেহারাটা কিন্তু একেবারে নিখুঁত, যেমন গড়ন তেমনি স্বাস্থ্য। মিসেস রাওকে হিংসে না ক'রে পারা যায় না।

কমলেশ জোরে শব্দ ক'রে হেসে ওঠে—যত খুশি হিংসে কর। কথা হলো, রাও যদি আমার স্কীমটা মঞ্জুর করতে আর বেশি দেরি করে, তা হলে ব্যাপার বড় বিশ্রী রকমের দাঁড়াবে।

উঠে দাঁড়ায় ধীরা। কমলেশের এই কুৎসিত বাঁকা হাসির বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড ঘৃণার ঝড় যেন ধীরার বুক তোলপাড় ক'রে ঠেলে উঠছে। ও হাসি আর সহ্য হয় না।

ধীরা বলে—মঞ্জুর করবেন বলেছেন।

আর কোন কথা না ব'লে বারান্দার নির্লজ্জ কালো পালিশকে জুতোর শব্দে মাড়িয়ে চলে যায় ধীরা। ঘরের ভেতর ঢুকেই চেয়ার টেনে টেবিলের কাছে বসে। হাতের কাছে কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লেখে ঃ

তোমার কাছেই গল্প শুনেছিলাম মেজদি। তোমার শ্বশুর বাড়ির গাঁয়ের কাছে কোন্ এক মস্ত জমিদার কোন্ এক বাঈজীর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিয়ে একেবারে ভিখিরী হয়ে গেছে। সারা গাঁয়ের লোক নাকি তাকে ঘেন্না করে? তোমাদের এই গেঁয়ো ঘেন্নার অর্থ আমি বুঝতে পারি না, মেজদি। লোকটা তবু একটা মানুষ তো! লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়ার লোভে সে তো পরের কাছে নিজের……।

চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয় ধীরা। টেবিলের ওপর কপাল ঠেকিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে!

চাকর এসে কখন টেবিলের ওপর চা-খাবার রেখে গেছে, কিছুই জানে না ধীরা। জ্বালাক্রান্ত মনটা যেন এই উজ্জ্বল সকাল বেলার বন্ধন কাটিয়ে নিবিড় এক অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে। এ দেশটা বেশ ঠাণ্ডা। মাটিতে কাদা, বাতাসে গোবরের গন্ধ, আলোক লতার গায়ে জোনাকি জ্বলে, গরু ডাকে, খড়মের শব্দ শোনা যায়, মানুষের দিদিমার মুখে কৃষ্ণনামের গানের শব্দে শেষ রাত্রির ঘুম ভাঙে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ধীরা। ঘুম ভাঙতেই চারদিকে তাকায়, এবং দেখতে পায় ঘরের জানালাগুলি রঙীন কাচ দিয়ে আঁটা। বোধ হয় দুপুর হয়ে এসেছে, এবং বিকেল হতেই বা কত দেরি? তারপর আসবে সন্ধ্যা। রাওয়ের গাড়ি এসে হর্ণ বাজাবে গেটের কাছে, মরণপথে টেনে নিয়ে যাবার জন্য নির্মম-গম্ভীর এক বাঁশির শব্দ। ভাবতে গিয়ে ধীরার সারা দেহ একটা বেদনায় মোচড় দিয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। দুহাতে কপাল টিপে আবার যন্ত্রণা চেপে রাখতে চেষ্টা করে, মাথা ঠুকে চূর্ণ করতে ইচ্ছে করে বন্ধ জানালার রঙীন কাচ।

যে কথাগুলি মুখ খুলে কমলেশের কাছে বলতে পারেনি ধীরা, মনে পড়ছে সেই কথাগুলি। রাও যা বলেছে সেই কথা। মানুষের

কথা নয়, মানুষের ফুসফুসখেকো বাঘের মুখের কথা। সে কথার জ্বালাগুলি এখনো ধীরার কানের ভেতর যেন ফোস্কা হয়ে জ্বলছে। রাওয়ের হাতের তৈরি পরিজ আজ হাসিমুখেই খেয়ে এসেছে ধীরা। মনে হয়, সে আজ এক পেয়ালা নর্দমার পাঁক হাসিমুখে খেয়ে ঘরে ফিরেছে।

কমলেশের কাছে রাওয়ের কথার শেষটুকুই শুধু বলেছে ধীরা, প্রথমটুকু বলে নি। অভ্ররাজ্যের জেনারেল ম্যানেজারের অনুগ্রহের সংবাদটুকুই শুধু শুনিয়েছে, কিন্তু তার সর্তের সংবাদটা শোনায় নি। শোনাতে চায় না ধীরা, শোনাতে ভয় করে। কারণ, সে কথার সবটুকু শুনেও যদি কমলেশের ঠোঁটে সেই দুর্মর বাঁকা হাসির রেখা কেঁপে কেঁপে ধীরাকে মরণপথে যাবারই প্রেরণা দিয়ে নীরবে বলে ওঠে—যাও! তবে?

এই ভয়, এ ছাড়া আর কোন ভয় নেই ধীরার মনে। এই বারোটা বছর যখন এতগুলি বাঘের দৃষ্টিকে দূরে দূরে রেখে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে ধীরা, আজও সে ইচ্ছে করলেই পারবে। কঠিন একটা গেঁয়ো প্রাণ যেন বুকের ভেতর লুকিয়ে থেকে এই মানহীন টাকার জীবনটাকে সন্দেহ করতে শিখিয়ে আসছে ধীরাকে, এই বারোটা বছর ধরে। কিন্তু নিজের এই শক্ত প্রাণটার দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্যও না হয়ে পারে না ধীরা। কোন্ আশায়, কোন্ লোভনীয়কে লাভের জন্য, কোন্ বরণীয়কে বরণ করার জন্য বারোটা বছরের মধ্যেও মরণপথে চলে না গিয়ে কিসের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছে ধীরা?

মনে হয় ধীরার, তার মনের ভেতর যেন শাখা সিঁদুর পরে এক মূর্খ বিশ্বাসের নারী ধৈর্য ধরে বসে আছে এখনো। সে নারীর স্বামী বিবাগী হয়ে কোথায় যেন চলে গেছে, গত বারো বছরের মধ্যেও তার

কোন খবর নেই। তবু সিঁদুর না মুছে এখনও প্রতীক্ষায় বসে আছে স্বামী ঘরে ফিরে আসবে, এই আশায়।

কিন্তু রাওয়ের ইচ্ছার সব কথা শোনার পরেও যদি পাথরের মানুষ চিৎকার করে না ওঠে? যদি সেই বাঁকা হাসির রেখাই কৃতার্থভাবে নিষ্ঠুর আনন্দে কাঁপতে থাকে, তবে? তবে এই সিঁথি হতে সিঁদুরের শীর্ণ রেখাটুকু মুছে ফেলতে হবে, রেখে আর লাভ নেই। সে হাসিতে চরম করেই জানা যাবে. ধীরার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। ফিরবে না আর, আর প্রতীক্ষার কোন অর্থ হবে না।

দরজার কাছে পায়ের শব্দে চমকে ওঠে ধীরা। ঘরে ঢোকে কমলেশ।

কমলেশ জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু রাও ঠিক কবে আমার স্কীমটা মঞ্জুর করবেন, সেই কথাটা আদায় করে নিতে পারলে না?

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ধীরা। বুঝতে পারে, বারো বছরের প্রতীক্ষার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেতে আর দেরি নেই। পাথরের মানুষ একেবারে চোখের সামনে এসেই দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে। উত্তর দিতে হবে।

ঝঙ্কার দিয়ে হেসে ওঠে ধীরা। ভুরু বাঁকিয়ে কমলেশের দিকে তাকায়। রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে ঠোঁট মুছে নিয়ে ধীরা বলে—আদায় করেছি।

—কবে সই করবেন?

—রাঁচি থেকে ফিরে আসার পর।

—কবে যাচ্ছেন রাঁচি, ফিরবেন কবে?

—আজই সন্ধ্যায় যাচ্ছেন। রাঁচিতে একদিন থেকে, তারপর হুডরু ঝর্ণা দেখতে যাবেন। সেখানে ডাকবাংলোতে দিন তিনেক থেকে আর পাখি শিকার করে, তারপর ফিরবেন।

—যাক্, এতক্ষণে একটা ভাল সংবাদ জানা গেল।

—আমিও যাচ্ছি।

—কোথায়?

—রাওয়ের সঙ্গে।

—এঃ, একটু আগে জানাতে পারনি?

—কেন বল তো?

—আমার গরম পোষাকগুলি এখুনি ধোপা এসে নিয়ে গেল ইস্তিরি করার জন্য।

—তাতে কি ক্ষতি হলো?

—ক্ষতি কিছু নয়, একটা অস্বস্তি। শীতের দিনে শুধু একটা শাল গায়ে দিয়ে মোটর জার্নিতে আরাম নেই।

খিল খিল করে হেসে ওঠে ধীরা—তুমি মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছো।

—মিছিমিছি কেন?

—তোমাকে যেতে হবে না। শুধু আমি যাব।

—কি রকম?

—রাও যে রকম বলেছেন, সেই রকম।

—ও, বুঝলাম!

ধীরার মুখের দিকে একবার তাকায় কমলেশ। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

রুমাল দিয়ে চোখ চেপে চুপ করে বসে থাকে ধীরা। শুনতে পায় দরজার বাইরে বারান্দার ওপর কমলেশের চটির শব্দ আনাগোনা করছে। আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে ধীরা। বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কমলেশের চটির শব্দ বারবার যাওয়া আসা করছে। অকারণে পরিশ্রম করছে কমলেশ। যেন হঠাৎ ভুলে গেছে কমলেশ, এত হাঁটাহাঁটি করলে এখুনি পরিশ্রান্ত হতে হবে আর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামও ফুটে উঠবে।

ধীরাকে আবার চম্‌কে দিয়ে ঘরে ঢোকে কমলেশ।—ব্যবস্থাটা একটু কাঁচা রকমের হয়েছে ধীরা। উচিত ছিল, আগে রাওকে দিয়ে দরখাস্তটা সই করিয়ে নেওয়া। তারপর নেমন্তন্ন করে আসতে, সবাই মিলে একদিন সূর্যকুণ্ড গিয়ে বেশ একটা ভাল রকমের পিকনিক ক'রে……।

ধীরা হাসে—কি যে বলো! রাও যা বলবে তাই তো হবে।

কমলেশ—তা তো হবে, কিন্তু রাও যাতে অদ্ভুত একটা কিছু না বলে বসে, তার জন্যে তুমি তো বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করবে।

ধীরা আরও জোরে হেসে ভ্রূভঙ্গি করে—তা হয় না। শেষে রাও আমাকে একটা অসভ্য মনে করুক আর কি! ছিঃ!

ব্যস্তভাবে ঘর ছেড়ে চলে যায় কমলেশ। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে ধীরা, কমলেশের চটি যেন কাঁটা-বেঁধা পায়ের চলার মত এলোমেলো শব্দ ক'রে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আর শোনা যায় না। কোথাও যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কমলেশ।

নিঝুম হয়ে চেয়ারের ওপর যেন শ্বাসবায়ুর সব অস্থিরতা প্রাণপণে দমন করে বসে থাকে ধীরা। তারপরেই শুনতে পায়, আলমারি খুলছে কমলেশ। কাঁচের গেলাস ঠুং ঠাং করে বেজে উঠছে। চোখ বন্ধ করে ধীরা। আবও উন্মাদ হবার জন্য তৈরী হচ্ছে একটা নিরেট বেদনাহীন পাথর। এ পাথরের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য ধীরাও সব শক্তি দিয়ে নিজেকেও যেন পাথর ক'রে নিয়ে তৈরী হয়।

চোখ খুলেই দেখতে পায়, ঘরের দরজার কাছে পর্দাটা খিম্‌চে ধরে দাঁড়িয়ে আছে কমলেশ। ঠোঁট ভেজা, কান দুটো লালচে।

কমলেশ বলে—একটা কথা আমার মনে হচ্ছে ধীরা। যদি রাঁচি থেকে ফিরে আসার পরেও রাও আমার দরখাস্তটা সই না করে?

ধীরা—না করে, না করবে। যাদের অনুগ্রহে কাজ হবে তাদের অনুরোধেরও একটা রিস্ক তো নিতেই হবে।

আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে ধীরার ঘরের ভেতর ঢোকে কমলেশ। এগিয়ে এসে খাটের ওপর একেবারে পা তুলে নিয়ে বসে। পাইপ ধরায়, মুখ ভরে ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর মেঝের দিকে নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বলে—রিস্ক অবশ্য কিছুই নয় ধীরা। কিন্তু রাওকে বিশ্বাস করতে খুব বেশি ভরসা পাচ্ছি না।

ধীরা—যার কাছ থেকে এত বড় উপকার চাইছো, তাকেই আবার অবিশ্বাস করছো। আশ্চর্য!

ধীরার মুখের দিকে তাকায় কমলেশ এবং তাকিয়ে থাকে। এ রকম ভাবে কোন দিন ধীরার মুখের দিকে তাকায়নি কমলেশ, দরকারও হয়নি। বোধ হয় একটু আশ্চর্যই হয়েছে কমলেশ। গেঁয়া খড়-মাটি দিয়ে অনেক যত্নে নিজের হাতে যে রঙীন পুতুল তৈরি করেছে কমলেশ, তাই আজ হঠাৎ একটা রঙীন পাথর হয়ে চেয়ারের ওপর বসে রয়েছে শক্ত হয়ে।

খাট থেকে নেমে আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় কমলেশ। পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। দেখা যায় বিকেল ফুরিয়ে আসছে, মাঠের শেষ প্রান্তে সূর্য নামছে লাল হয়ে।

—আশ্চর্যই হচ্ছি, তোমাকে দেখে।

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে ঘর ছেড়ে চলে যায় কমলেশ।

সূর্য কখন্ ডুবে গেছে বুঝতে পারেনি ধীরা। যখন বুঝতে পারে তখন ঘরের ভেতরটা অন্ধকারে ভরে গেছে। বাইরের বারান্দায় হঠাৎ একটা কাচের গেলাস ঝনঝন করে চূর্ণ হয়, আর স্প্যানিয়েল চিৎকার করে ওঠে।

ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ধীরা, আলো জ্বালে। মুখটা মোছার জন্য তোয়ালে হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু

মুহূর্তের মধ্যে, যেন এই আলো দেখতে পেয়েই বাইরের বারান্দা কাঁপিয়ে এক জোড়া সন্দেহক্ষিপ্ত পায়ের শব্দ ছুটে এসে ধীরার ঘরে ঢোকে।

কমলেশ ভ্রূকুটি ক'রে বলে—ও কি? সত্যিই সাজতে আরম্ভ করলে নাকি?

আয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধীরা বলে—কি?

কমলেশ বলে—মোট কথা, রাওয়ের উপকারে আমার কোন দরকার নেই ধীরা।

কমলেশের চোখ ছুটো টকটকে লাল আর মুখটা যেন ভয়ানক একটা গ্রীষ্মের রোদে পুড়ে কালো হয়ে উঠেছে।

ধীরা বলে—দরকার নেই তো নিও না।

কমলেশ—নেব না, চাই না। এবার আমার কথাটা বুঝতে পারছো নিশ্চয়।

ধীরা—কিছু না।

কমলেশ—রাওয়ের সঙ্গে তোমার রাঁচি যাবার কোন দরকার নেই। বুঝেছ?

উত্তর দেয় না ধীরা।

দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে কমলেশ বললে—বুঝেছ?

অনড় শিলামূর্তির মত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধীরা। কাঁপে না, উত্তর দেয় না।

আহত শ্বাপদের মত পিছিয়ে আসে কমলেশ, তার পরেই ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়, আর, যেন এক মুহূর্তের মধ্যেই একটা চাবুক হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে ধীরার পাথুরে মূর্তির সামনে দাঁড়ায়।

কমলেশ—বুঝেছ কিনা বল? উত্তর দাও ধীরা!

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ধীরা। ফুলের পাপড়ির মত নরম ঠোঁট তুটিও যেন ভাষা হারিয়ে পাথর হয়ে গেছে।

হঠাৎ ধীরার মাথা লক্ষ্য করে চাবুক তোলে কমলেশ। ধীরার চোখের তারা চমকে ওঠে, কমলেশের মুখের দিকে তাকায়। দস্যুর মত মূর্তি, একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ধীরার সম্মুখে। চোখে জ্বলছে পুরুষ-হিংসার বন্য আগুন। এক নারীকে ওর হৃৎপিণ্ডের গুহায় বন্দী করে রাখবার জন্য পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। তুই ঠোঁট স্পন্দিত করে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে ধীরার মুখে।

কমলেশের হাতের চাবুক মত্ত আক্রোশে থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে, তবু ধীরার মাথা একটুও কাঁপে না। বোধ হয় পাথরের তৈরী মাথা, চাবুকের আঘাতেও কোন ব্যথা দেওয়া যাবে না।

চাবুক-তোলা হাত ধীরে ধীরে নামিয়ে ফেলে কমলেশ। ক্লান্ত অবসন্ন ও পরিশ্রান্তের মত আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে। দেখতে পায় ধীরা, কমলেশের কপালে বিন্দু বিন্দু জল, লালচোখের তুই কোণে তুটো বড় বড় জলের ফোঁটা।

হাসতে থাকে ধীরা।

চাবুকটা ধীরার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কমলেশ বলে—যাও।

পর মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নেয় কমলেশ, আর টলতে টলতে ধীরার ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, আর প্রায় দৌড়ে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে সোফার ওপর শুয়ে পড়ে।

ধীরাও ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। চোখ মুখ ছাপিয়ে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। যেন বারো বছর ধরে বুকের ভেতর এক কানাচে মুখ লুকিয়ে অপেক্ষায় বসেছিল এই হাসি, এত দিনে মুক্তি পেয়েছে। আজ এই সন্ধ্যার বাতাস আর অন্ধকারকে একেবারে নিজের ঘর বলে মনে হয়। এই বারান্দার ওপর মনের আনন্দে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। আজ স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া গেছে,

পাথরের বুক ফুঁড়ে জল দেখা দিয়েছে। জ্বালা লেগেছে, তাই তো ওর চোখ লাল হয়েছে। ব্যথাও পেয়েছে নিশ্চয়, তাই মুখ কালো হয়ে গেছে। এতদিনে স্বপ্ন সত্য হলো ধীরার। এই তো কয়েক মুহূর্ত আগে তার বারো বছরের নিরুদ্দিষ্ট বিবাগী স্বামী এই দরজার কাছে এসেই দেখা দিয়ে গেছে। দূরে নয়, ঐ ঘরেই তো সে রয়েছে।

বারান্দার ওপরেই মেঝেতে আঁচল পেতে শরীর লুটিয়ে দিয়ে শুয়ে সন্ধ্যার তারাগুলি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে বড় লোভ হয় ধীরার। মনে হয়—স্বামী আছে, সংসার আছে, কত কাজ আছে। কাজে নামবার আগে একটু জিরিয়ে নিলে দোষ কি ?

দেখতে পায় ধীরা, বাগানের কোণে মালির ঘরের কাছে বসে চাকর বাবুর্চি ও মালি জটলা পাকিয়ে গল্প করছে। তিন মাসের মাইনে পায়নি ওরা, তাই কাজে গরজ নেই। চাকর, বাবুর্চি ও মালিকে ডাক দেয় ধীরা। হিসেব করে তিন মাসের মাইনে চুকিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ও করে দেয়—এখুনি চলে যাও সব, আর দরকার নেই।

মনে পড়ে ধীরার, কাল সকালে পাওনাদারের দল আসবে। আসুক. আসবাবপত্র যা কিছু আছে এবং দরকার পড়ে তো ছাইপাশ সোনা আর জড়োয়া যা আছে, সবই নিলাম করে দিয়ে দেনা মিটিয়ে দিতে হবে। বারো বছরের আবর্জনা সরিয়ে তার জীবনের চাপা-পড়া ছোট্ট একটা সংসারকে এইবার খুঁজে বের করে নিতে হবে। কাজ আছে বৈকি। অনেক কাজ আছে।

নিজের ঘরে ঢুকে বাক্স খোলে ধীরা। স্তরে স্তরে সাজানো শাড়ির একেবারে সব চেয়ে নীচের স্তরে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকে, বারো বছর আগেকার এক উৎসবদিনের আশীর্বাদগুলি মুখ লুকিয়ে যেখানে পড়ে আছে। একটা কল্কাপেড়ে মোটা

সূতোর মিলের শাড়ি হাতে উঠে আসে। দেখা মাত্র মনে পড়ে, এটা মেজদির আশীর্বাদ।

স্নান সারার পর, কল্কাপেড়ে শাড়ি পরে, মোটা বিনুনি করে খোঁপা বেঁধে আর কপালে কাজলের ছোট টিপ দিয়ে আয়নার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসে ধীরা। তারপরেই ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে ঢোকে।

সন্ধ্যে গভীর হয়েছে। বরাকরের বুকের বাতাস শীতে থমকে আছে। বাংলো বাড়ী অন্ধকারে ডুবে আছে, সাদা ইউকালিপ-টাসকেও আর দেখা যায় না, শুধু রান্নাঘরে একটুখানি আলো। শব্দ নেই কোথাও, শুধু রান্নাঘরে হলুদ-বাটা শিল-নোড়ার শব্দ এই নিরেট স্তব্ধতাকে সজাগ করে রাখছে।

হঠাৎ গেটের কাছে রাস্তার ওপর মোটর গাড়ীর হর্ন বেজে ওঠে—সুগম্ভীর প্রমত্ত হর্ণের স্বর—একটানা ব্যাকুল ও অবিরাম।

রান্নাঘরের শিলনোড়ার শব্দ থামে না। মোটর গাড়ীর প্রমত্ত হর্ণের শব্দ যেন ঘরের দেয়ালে ঠিক্‌রে বাইরেই পড়ে থাকছে, ঘরের ভেতর এ শব্দ যেন ঢুকতে পারছে না।

কিন্তু হঠাৎ আর একটা কিরকমের যেন শব্দ। শিল-নোড়া থামে। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে ধীরা। শুনতে পায়, বারান্দার পাশের ঘরের ভেতরে যেন একটা গলাভাঙা চিৎকার বেজে উঠেছে, ভীত মানুষের আর্তনাদের মত।

রান্নাঘর ছেড়ে ছুটে এসে কমলেশের ঘরে ঢোকে ধীরা। আলো জ্বালে। সোফার ওপর শায়িত কমলেশের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে?

কমলেশ তাকিয়ে থাকে ধীরার দিকে। যেন বারো বছরের একটা রোগীর ঘুম হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্নে ভেঙে গেছে এবং চোখ খুলেও আতঙ্কিতের মত নিজেই বুঝতে চেষ্টা করছে, কি হয়েছে।

হলুদমাখা হাত, কস্কাপেড়ে সাড়ি, কপালে কাজলের টিপ। নদে জেলার পাড়াগাঁয়ের স্কুল মাস্টারের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলে কমলেশ —না কিছু হয়নি। আমি মিছিমিছি ভয় পেয়েছিলাম।

মায়া কুহেলী

ঘড়ির কাঁটা বলছে, ভোর হয়েছে। সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু মাঘ মাসের ভোরের এই কুয়াশাকে রাতের অন্ধকারের শেষ ঘুমের যত নিঃশ্বাসের বাষ্প বলে মনে হয়। দমদম এয়ারপোর্টের যত আলো কুয়াশার প্রলেপে ভেজা ভেজা হয়ে যেন ছলছল করে, জ্বলজ্বল্ করে না।

যাকে বিদায় দেবার জন্য এই ভোরে এয়ারপোর্টে এসে ঝলমলে রেস্টরুমের একটি কোচের উপর বসে আছে মানসী, সে কিন্তু এখনও এসে পৌঁছায়নি। নীতীশকে বোম্বাই নিয়ে যাবে যে ভাইকাউন্ট, সেটা ছাড়বে সকাল সাতটায়।

যার জন্যে আরও দুটি বছর অপেক্ষার কষ্ট সহ্য করতে হবে, তারই জন্যে বড় জোর আরও দেড় ঘণ্টার অপেক্ষা। বুকের ভিতর একটা চাপা-নিঃশ্বাসের যে কষ্টটা মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে উঠছে, সেটাই মানসীর আশার জীবনটাকে যেন ভয় পাইয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, মাত্র আর দেড়ঘণ্টার পথ-চাওয়া প্রতীক্ষাতেই যদি এত বেদনা থাকে, তবে পুরো দুটি বছরের পথ-চাওয়া আশার জীবন যে শুধু ভেবে ভেবে আর কষ্ট পেয়ে পেয়ে একটা শাস্তির জীবন হয়ে উঠবে।

সঙ্গে এসেছেন ভক্তি মাসিমা। তিনি তাঁর সর্বক্ষণের আদরের সেই উলের থলি আর কাঁটা-জোড়াও সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলে যাননি। বয়স হয়েছে ভক্তি মাসিমার। কিন্তু চলা-ফেরার কাজে

এখনও কোন স্থবিরতার বাধার ভার বোধহয় অনুভব করেন না। চিরকুমারী মানুষ, স্কুলের মেয়ে পড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন। সবচেয়ে সিনিয়র টিচার ভক্তি মাসিমা এখন তাঁর মেয়ে-স্কুলের হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সাদা চুলের খোঁপাটা শক্ত করে বাঁধা, চশমাটা শুধু একটু ঝুঁকে পড়েছে, মানসীর পাশের কোচের উপর বসে একমনে উলের একটা জামপার বুনছেন ভক্তি মাসিমা। সেজ ভাই সমীরের বড় মেয়ে সুনন্দার জন্মদিনে এই জামপার উপহার দিতে হবে। আর মাত্র সাতটা দিন বাকি; কাজেই, ভক্তি মাসিমা শুধু তাঁর হাতের উল আর কাঁটা নিয়েই ব্যস্ত।

মানসীও টিচার। ঐ একই স্কুলে, যে-স্কুলের সবচেয়ে সিনিয়র টিচার হলেন ভক্তি মাসিমা। আর, ঐ মেয়ে-স্কুলেরই হস্টেলের একটি ঘর হলো মানসীর জীবনের ঘর। বাবা মারা গেছেন পনর বছর আগে। মা মারা গেলেন, সে'ও তো আজ প্রায় পাঁচ বছর আগের ব্যাপার। দাদা তো মা মারা যাবারও সাত বছর আগে থেকে আম্বালাতে থাকেন। দাদা বিয়ে করেছিলেন কানপুরে; কিন্তু সেই বউদি আজ আর বেঁচে নেই। শুনেছিল মানসী, বউদি বেচারা খুবই ভাল মানুষ ছিল। দেখতে খুব সুন্দর। দাদা কিন্তু, যেন একটা প্রতিজ্ঞা করে, বউদিকে কোনদিন আম্বালাতে নিয়ে যাননি। বিয়ের পর তিন বছর ধরে, যেন একটা আশার অপেক্ষায় থেকে থেকে, শেষে কঠিন একটা অসুখে পড়ে মরেই গেলেন সেই বউদি। মারা যাবার আগে মানসীকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন সেই বউদি—আমি তো ইচ্ছে করলেই আম্বালাতে যেতে পারি। কিন্তু গিয়ে লাভ কি? সে এসে যদি না নিয়ে যায়, তবে যেয়ে লাভ নেই। কারও অনিচ্ছার সঙ্গে জোর করে ঘর করা যায় না।

ভক্তি মাসিমা মানসীকে বলেছিলেন, মেয়ের জীবনে একটা অসম্মানের বিয়ের চেয়ে চিরকুমারী হয়ে আর একলা হয়ে পড়ে

থাকাও শান্তির জীবন। তা ছাড়া···কথাটা বলতে গিয়ে ভক্তি মাসিমা যেন বেশ জোরে একটা হাঁপ ছেড়েছিলেন—মানুষ চেনা বড় কঠিন।

মানসীর বুকের ভিতরটা যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল। ভক্তি মাসিমা কি মানসীকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন? নীতীশকেও কি চিনতে পারেনি মানসী? আজ দু'বছর ধরে যে মানুষ মানসীকে ভালবেসে সুখী হয়ে আছে, মানসীর মুখের দিকে তাকালে যার চোখ দুটো এত স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে; সেই মানুষ, সেই নীতীশও কি কঠিন মানুষ? চেনা কঠিন?

এ-কথা অজানা নয় মানসীর, নীতীশের বাড়ির মানুষেরা নীতীশের বিয়ে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। অনেক শিক্ষিতা সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু নীতীশ স্পষ্ট ভাষায় বাড়ির সব মানুষকেই জানিয়ে দিতে পেরেছে, নামটাও বলে দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেনি; টিচার মানসী সেনের সঙ্গেই একদিন বিয়ে হবে নীতীশের।

রাণু কাকিমা প্রশ্ন করেছিলেন—ভালবাসার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে?

নীতীশ বলেছিল—হ্যাঁ।

রাণু কাকিমা মুখভার করেছিলেন—তবে আর আমাদের কিছু বলবার নেই।

কিন্তু নীতীশের দিদি আর বোন, অর্থাৎ অনুভা আর মৃদুলা তবু আপত্তির স্বরে প্রশ্ন করেছিল—তোমার মত পজিশনের মানুষের সঙ্গে কি মানসীকে মানায়?

নীতীশ—আমি মানিয়ে নিলেই মানায়।

কথাটা ঠিকই বলেছিল নীতীশ। আর নীতীশের মুখ থেকে একথা শুনতে পেয়ে মানসীর সব নিঃশ্বাসই যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নীতীশ ভালবাসে মানসীকে, এ-ভালবাসাকে অসাধারণ একটা উদার হৃদয়ের ভালবাসা বলে বিশ্বাস করতেই হয়। ম্যাট্রিক পাস-করা এক অতিসাধারণ মেয়ে, পঁয়ষট্টি টাকা যার মাইনে, আর এই পঁয়ষট্টি টাকা না পেলে যার প্রাণ বোধহয় উপোষ করেই মরে যাবে, সে মেয়েকে ভালবেসেছে ব্রাইট এণ্ড টমসনের মেশিন কোম্পানির চীফ ইঞ্জিনিয়ার নীতীশ ; মাইনে যার দু'হাজার টাকা, তিন তলা যার বাড়ি, আর, যার গ্যারেজে তিনটে গাড়ির মধ্যে একটা গাড়ি শুধু অলস হয়ে পড়ে থাকে। নীতীশের তিন কুলের কোন ছেলে মানসীর মত এত সাধারণ কোন মেয়েকে বিয়ে করেনি।

সাধারণ মেয়ে মানসী, ঠিকই, ঝলমলে রূপসী সে নয়। কিন্তু চোখ দুটোকে একটু অসাধারণ বলে মনে করতেই হয়। টানা-টানা চোখ, কালো তারা দুটোতে অদ্ভুত এক নিবিড়তার মায়া টলমল করে। চোখের বড় বড় পাতায় যেন একটা ঘুমন্ততার ছায়া জড়িয়ে আছে। চোখ বড় করে তাকাতে পারে না মানসী, কিন্তু চোখ ছোট করে তাকাবার এই ভঙ্গীটা যেন একটা বিস্ময়, মানসীর সারা মুখ সেই বিস্ময়ে অদ্ভুত রকমের সুন্দর হয়ে ওঠে। ভক্তি মাসিমা বলেন, কালো মেয়ে ; কিন্তু এক-একদিন যখন স্নান সেরে ভক্তি মাসিমার কাছে এসে চুপ করে আনমনার মত দাঁড়িয়ে থাকে মানসী, তখন ভক্তি মাসিমার চোখে যেন অদ্ভুত এক স্নেহ চিকচিক করতে থাকে। ভক্তি মাসিমা বলেন, আমাদের সুনন্দার মুখটাও ঠিক তোরই মুখের মত। চন্দনের মত রং।

শুনে হেসে ফেলে মানসী। নীতীশও একদিন বলেছিল, বুঝতে পারি না মানসী, তোমাকে মাঝে মাঝে কেন এত সুন্দর মনে হয় !

একদিন সাহস করে, আর বেশ একটু নির্লজ্জ হয়ে মানসীও বলে দিয়েছিল, তোমার চোখ দুটো এত সুন্দর, তাই।

কিন্তু…, যে-কথাটা বলতে গিয়ে আজও লজ্জার বাধা অনুভব

করে মানসী, সে-কথা সেদিন নীতীশ নিজেই বলে ফেলেছিল—কিন্তু, ভাবছি, বিয়েটা কবে হবে।

অপলক চোখ তুলে, যেন জীবনের এক পরম প্রতিশ্রুতির বাণী শোনবার আশায় নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মানসী। ময়দানের কৃষ্ণচূড়ার উপর তখন সন্ধ্যার আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সাদা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালও যেন লালচে হয়ে উঠেছে। মানসীর একটা হাত শক্ত করে ধরে নীতীশ বলে—আগে বিদেশ থেকে ঘুরে আসি। তারপর…।

—কি বললে? চমকে ওঠে মানসী।

নীতীশ—বড় জোর দুটো বছর; ছটা মাস লণ্ডন, তারপর জার্মানী আর ইতালী। মেশিন তৈরীর কয়েকটা প্রসেস স্টাডি করে দেশে ফিরে আসবো। ব্রাইট এণ্ড টমসনের ডিরেক্টর বোর্ড বলেছে, তাহলে আমার মাইনে হবে প্রায় তিন হাজার টাকা।

আরও নিবিড় আগ্রহের সুরে, মানসীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে, যেন তৃপ্তিময় নিঃশ্বাসের ভাষার মত ফিসফিস করে কথা বলে নীতীশ—আমার অদ্ভুত একটা ধারণা হয়েছে মানসী, তোমাকে ভালবাসি বলেই যেন আমার প্রসপেক্ট দিন দিন বড় হয়ে উঠছে। আমার অ্যামবিশন, আমি একদিন ব্রাইট এণ্ড টমসনের জেনারেল ম্যানেজার হব। …কি? কথা বলছো না কেন মানসী?

—হও। মানসীর মুখের চন্দন রং যেন ঝলক দিয়ে উথলে ওঠে।

ঘড়ির কাঁটা বলছে, ছটা বেজেছে। কুয়াশা একটু ফিকে হয়েছে বলে মনে হয়। এয়ার ফিল্ডের ট্যাক্সি-ট্রাকে তখনও জ্বলছে গুজ-নেক ফ্লেয়ার। রানওয়ের নিশানা জানিয়ে দিয়ে সোডিয়াম বার-লাইট

জ্বলজ্বল করছে। মাইক ডাকছে, এয়ার-ফ্রান্সের যাত্রীদের তৈরী হয়ে নেবার জন্য। ইন্দোনেশিয়া থেকে একজন মহামান্য নাকি আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দুটো হেলিকপটর জাতীয় পতাকা উড়িয়ে নিয়ে আর প্রচণ্ড শব্দ করে পূবের আকাশে উধাও হয়ে গেল। একদল লোক বলাবলি করে—হাওয়াই ফৌজের কয়েকটা তুফানীও এইবার রওনা হবে।

ঘড়ির কাঁটা বলছে, ছ'টা পনর। এয়ার ফ্রান্সের জেট প্লেন অনেকক্ষণ আগেই গোঁ গোঁ করে উধাও হয়ে গিয়েছে। রেস্টরুমের চাঞ্চল্য বেশ মৃদু হয়ে এসেছে। কে জানে কোন্ দেশ থেকে কোন্ প্লেনের হস্‌টেস ঐ মেয়ে দুটি, যারা এখন ক্লান্তভাবে একটা কোচের উপর বসে আর হাতের ব্যাগ খুলে আয়না বের করেছে। একজন চুল আঁচড়ায়; একজন ঠোঁটে লিপস্টিক বোলায়।

মানসীর কোচ থেকে দুটি কোচের পরেই একটি কোচে অনেকক্ষণ থেকে চুপ করে বসেছিলেন এক প্রৌঢ়া শ্বেতাঙ্গী, হাতে একটা হিন্দী বই। গাউন-পরা সাজ বটে, তবু একটা কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়িয়েছেন। মনে হয়, অনেকদিন ভারতে আছেন এই মহিলা। মানসীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মহিলা স্নিগ্ধ হাসি হেসে আর হাত তুলে বলেন—নমস্তে শ্রীমতী, নমস্তে।

ভক্তি মাসিমা আশ্চর্য হয়ে শ্বেতাঙ্গী প্রৌঢ়ার মুখের দিকে তাকালেন। শ্বেতাঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—বিউটিফুল ইণ্ডিয়াকো ম্যায় বহুৎ পিয়ার কর্‌তা হু।

একজন কাস্টম অফিসার এসে মহিলার একটা ব্যাগের দিকে তাকিয়ে কি যেন বললেন।

সেই মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গী মহিলা রুষ্ট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। হোয়াট্‌। সাস্‌পেক্ট মী?

কাস্টম অফিসার বিনীতভাবে হাসেন—আমি আমার ডিউটি করছি ম্যাডাম।

মহিলা বলেন—ব্যাগের মধ্যে সন্দেহের কিছুই নেই। ওন্‌লি এ ব্রঞ্জ নাটারাজা অ্যাণ্ড এ স্টোন গ্যান্‌ডি।

—আই বিলিভ ইট। কাষ্টম অফিসার জানালেন, কিন্তু ব্যাগটার ভিতরটা একবার দেখবার দাবি ছাড়লেন না।

অগত্যা ব্যাগ খুললেন শ্বেতাঙ্গী প্রৌঢ়া। ঠিকই, ব্রঞ্জের নটরাজ ছিল, পাথরের গান্ধীও ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল পনর জোড়া জুতো।

কাষ্টম অফিসার বললেন—নাউ, প্লীজ পে ফর ইট।

—হোয়াট! ইজ দীস ইণ্ডিয়ান ম্যানার?

—ও ইয়েস। কাষ্টম অফিসার আবার হাসেন।

শ্বেতাঙ্গী প্রৌঢ়া বলেন—শেম!

কিন্তু, একি? চমকে ওঠে মানসী। কখন এসেছে, আর এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নীতীশ. দেখতেই পায়নি মানসী। মানসীর এত সাধের অপেক্ষার আর আশার চোখ দুটো যেন ধন্য হয়ে নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকুক।

—কখন এসেছ মানসী?

প্রশ্ন করতে গিয়ে নীতিশের চোখ দুটোও যেন একটা মুগ্ধতার সুখে জ্বলজ্বল করে।

মানসীর পাশের কোচটা খালি। যেন নীতীশের জন্য, মানসীর বিষণ্ণ মনটাকে আর একবার ভালবাসার আশ্বাসে ভরে ওঠবার সুযোগ দেবার জন্যই কোচটা খালি হয়ে পড়ে আছে। বসুক নীতীশ, বিদায়-মুহূর্তের আগের সময়টা মধুরতায় ভরে যাক। নীতীশের এই মুগ্ধ চোখ দুটো মানসীর ঝাপসা চোখের দিকে তাকিয়ে ঝাপসা হয়ে যাবে, আজ নীতীশের এই দূরে চলে যাবার কঠোর

ঘটনাটাও যে মানসীর জীবনে একটা স্নিগ্ধ প্রতিশ্রুতির আনন্দ হয়ে উঠবে।

মানসীর পাশের কোচের উপর বসেই ব্যস্তভাবে কথা বলে নীতীশ —আমাকে বোধ হয় পুরো তিনটে বছর বিদেশে থাকতে হবে।

মানসীর চোখের কালো তারায় যেন একটা হঠাৎ-বেদনার আঘাত লেগে চমকে ওঠে।—আরও একটা বছর!

নীতীশ হাসে—হ্যাঁ।

মানসীর কালো চোখের বিস্ময় যেন একটু হতভম্ব হয়ে যায়। কী অদ্ভুত প্রসন্নতার আবেগে উজ্জ্বল হয়ে হাসছে নীতীশের দুই চোখ। নীতীশ যেন বিদায়-মুহূর্তের করুণতার মধ্যে একটুও বেদনার ছায়া দেখতে পাচ্ছে না।

বেশ সুস্থ বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক, বয়সে নীতীশেরই সমান হবে বলে মনে হয়, পাটকিলে রঙের পশমের ট্রাউজার আর কোট গায়ে, হাতে একটা ছোট ব্যাগ, ঠিক মানসীর মুখোমুখি হয়ে অপর সারির একটা কোচের উপর বসলেন।

মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীতীশ বলে—এখন পুরো দুটো বছর লণ্ডনে, তারপর কন্টিনেণ্ট।

অপরিচিত ভদ্রলোক যেন হঠাৎ একটা খুশির উল্লাসে বলে ওঠেন—আপনি লণ্ডন যাচ্ছেন?

নীতীশ—হ্যাঁ।

—এখন তাহলে এই সাতটার প্লেনে বোম্বাই যাবেন?

—হ্যাঁ।

—আমিও যাচ্ছি।

—কোথায়?

—লণ্ডন।

—উদ্দেশ্য?

—উদ্দেশ্য হলো প্রসপেক্ট। রয়্যাল নেভিতে অ্যান্টি-সাবমেরিনের ট্রেনিং নেবার জন্য সিলেক্টেড হয়েছি। তিনজন ভাগ্যবানের মধ্যে আমি একজন।

—আপনি কি এখন ইণ্ডিয়ান নেভিতে…।

—হ্যাঁ, এতদিন অবশ্য মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ছিলাম।

অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আর কথা বলবারও কোন আগ্রহ নেই। দরজার দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় নীতীশ—এসেছে, ওরা সবাই এসেছে।

মানসী—কারা এসেছে?

—আমার অফিসের ষ্টাফ।

মস্ত বড় ফুলের মালা আর অনেক ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে নীতীশের অফিসের একদল লোক এসেছে।

এসেছে ব্রাইট অ্যাণ্ড টমসনের কমার্শিয়াল ম্যানেজার উইলিয়াম-সন। এসেছে দিদি অনুভা আর বোন মৃদুলা। রাণু কাকিমাও এসেছেন। বিপুল এক সমাদরের আর শ্রদ্ধার জগৎ থেকে যেন নানা উপহারের একটা মুখর ভিড় নীতীশের বিদায়ের উৎসবকে হাসিতে-খুশিতে রঙীন করে দেবার জন্য এসেছে। আর, নীতীশও যেন মন-প্রাণের সব আগ্রহকে বিপুল ব্যস্ততায় মত্ত করে নিয়ে এই বিদায়-উৎসবের আনন্দকে ধন্য করে দিতে চায়। ছট্‌ফট্ করে উঠে দাঁড়ায় নীতীশ।

মৃদুলা ডাকছে—নীতুদা, শিগগির এদিকে এস।

চলে যায় নীতীশ। চোখ তুলে দেখতে পায় মানসী, সত্যিই যে ব্যস্ততাময় একটা প্রশস্তির উৎসবের মধ্যে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীতীশ। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া আর করমর্দন। শুধু গুড লাক আর গুড লাক! কত রকমের হাসি, কত রকমের খুশির গুঞ্জন নীতীশকে ঘিরে ধরেছে।

মানসীর মনের সেই অসার কল্পনাটা যেন নিজের লজ্জায় মরে যায়। আজ নীতীশের ঝাপসা চোখ দেখবার আশাটাই যে একটা বিদ্রূপ।

ঘড়ির কাঁটা বলছে, ছটা পঁয়তাল্লিশ। মাত্র আর পনরটা মিনিট, মানসীর জীবনের গত দু'বছরের ভালবাসার মানুষ, মানসীর আশার প্রতিশ্রুতি ঐ নীতীশ রায় যে তারপরেই আকাশলোকের যত মেঘের ঢেউ পার হয়ে চলে যাবে।

মাইক বলছে, ফগ গলে গিয়েছে, ভিজিবিলিটি অতি চমৎকার। কিন্তু মানসীর চোখ দুটো যেন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথায় ভিজিবিলিটি ? কিছু না। সবই যে ধোঁয়াটে বলে মনে হয়।

তবু দেখতে পাওয়া যায় ; অনুভাদি যেন কটমট করে মানসীর দিকে তাকিয়ে মৃদুলার সঙ্গে কথা বলছেন। মৃদুলার ঠোঁটের ফাঁকে একটা হাসির রেখা কুঁচকে রয়েছে ; মানসীর আশার দুঃসাহসকে যেন তীব্র একটা শ্লেষ দিয়ে বিঁধে খুশি হয়ে উঠছে মৃদুলার হাসিটা।

ভক্তি মাসিমা হঠাৎ কি যেন বললেন। মানসী চমকে ওঠে।

—কি ?

দূরের কোচের উপর তেমনই শান্তভাবে বসে আর হাতের উলের দিকে তাকিয়ে ভক্তি মাসিমা বললেন—চল, এবার যাই।

সামনের কোচের উপর বসা সেই ভদ্রলোক হঠাৎ বলে ওঠেন—এখনও সময় আছে।

—কি বললেন ? ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে মানসী।

—বলছিলাম···ঐ যে উনি···আপনার কে হন জানি না···উনি তো এখনও চলে যাননি। প্লেন ছাড়ার এক মিনিট আগেও সীট নেওয়া যায়।

মানসী বিড় বিড় করে—বুঝলাম না।

—উনি যে প্লেনে বোম্বাই যাবেন, আমিও সেই প্লেনেই বোম্বাই যাব। এখনও সময় আছে। উনি আবার এখানে ফিরে আসবেন; কাজেই আপনার এখনই চলে যাবার দরকার হয় না।

মানসী হাসে—কিন্তু আপনি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?

—আজ্ঞে? কি বললেন?

—যাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁদের এতক্ষণে এসে পড়া উচিত ছিল।

—না না; কেউ আসবে না; কারও আসবার কথা নেই। আমি কারও অপেক্ষা করছি না।

মানসী আবার হাসতে চেষ্টা করে—এটা একরকম ভাল। দেখা সাক্ষাৎ আগেই সেরে নিয়ে এখানে আসা উচিত। এখানে হৈ হৈ করে বিদায় দেবার আর নেবার ঘটা দেখাবার কোন মানে হয় না।

—আমার অবশ্য ওসব কোন ঝঞ্ঝাটের ভয় নেই। এখানে-ওখানে কোথাও কারও কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেবার ব্যাপার আমার অদৃষ্টে নেই।

—কেন?

—আপনজন বলতে একমাত্র মা ছিলেন; তিনিও ছ'মাস আগে চিরকালের মত চলে গিয়েছেন। কাজেই···।

—কেন, বন্ধু-বান্ধব?

—কিচ্ছু না। আমি সেদিক দিয়ে খুব ফরচুনেট, একেবারে একলা।

ঠিকই, ভদ্রলোক যেন একেবারে একলাটি হয়ে শান্তভাবে বসে আছেন। বিদায় দিতে একটা মানুষও আসেনি! কোন উৎসব এসে খুশি হয়ে এই ভদ্রলোকের হাতে অভ্যর্থনার ফুল তুলে দিচ্ছে না। কোন চোখ করুণ হয়ে এই ভদ্রলোকের দিকে তাকাচ্ছে না।

হাতের ঘড়ির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে যেন নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন ভদ্রলোক।—মা বলেছিলেন, আমাকে আগে মরতে দে অজয়, তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যাস্। তাই হলো, মা মারা গেলেন, আর ছ' মাস পরেই বাইরে যাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

অজয় হঠাৎ যেন আনমনার মত তাকিয়ে কথা বলতে থাকে—আমারও ইচ্ছে করে, চিরকাল বাইরেই থাকি। তা অবশ্য সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবে কম্যাণ্ডের কর্তারা খুশি হলে আরও ছু'-চার বছর ট্রেনি হয়ে বিদেশে থাকবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

বুঝতে পারেনি মানসী, শুনতেও পায়নি বোধ হয়, আরও কত কথা ও কি কথা বক্ বক্ করে বলেই চলেছেন এই ভদ্রলোক, যাঁর নাম অজয়। মনে হয়, সংসারের সব মায়ার টান থেকে ছাড়া-পাওয়া একটা মানুষ যেন সমুদ্রের জলে চিরকাল ভেসে থাকবার স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলছে। রূপকথার মত সে-সব কথার কিছু বোঝা যায়; কিছু বোঝা যায় না। ঝড়ের দিনে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে ডেষ্ট্রয়ার। শত্রুর সাবমেরিনের পেরিস্কোপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, পাঁচ মাইল নৈঋতে; ডেকের উপর ডয়াল ডেপ্‌থ চার্জ মজুদ হয়ে আছে। রাডারে অনেক দূরের একটা বিমানের চোরা আবির্ভাবের গুঞ্জনও ধরা পড়ে গিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠেছেন অফিসার—চার্জ। বাতাসের বুকের উপর যেন একটা ক্ষিপ্ত আক্রোশের গর্জন ফেটে পড়ল। তোলপাড় সমুদ্রের বুকে একটা জলস্তম্ভ উথলে উঠছে।

—ভাবতে মন্দ লাগছে না। এরকম কাজে দিনগুলি এক রকম ভালই কেটে যায়।

মাইক অনুরোধ করেছে, বোম্বাই-যাত্রীরা এবার এগিয়ে যেয়ে প্লেনে উঠুন। মানসী বলে—সময় হয়েছে।

অজয় বলে—হ্যাঁ।

কিন্তু অ্যান্টি-সাবমেরিনের অজয় যেন সমুদ্রের আহ্বানের সব আবেদন ভুলে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি-যেন বলতে চাইছে অজয়।

মানসীর বুকের ভিতরেও যেন দুরন্ত একটা অস্বস্তি ছটফট করছে। বিড়বিড় করে মানসী—আসুন তাহলে।

অজয় বলে—আশ্চর্য ব্যাপার।

মানসী—কি?

অজয়—যেতে ইচ্ছে করছে না।

মানসীর চোখের কালো-তারা ছটফট করে ওঠে,—ছি, ছি, না না. এ কী অদ্ভুত কথা বলছেন! আপনার প্রসপেক্ট…।

অজয় করুণভাবে হাসে—হ্যাঁ, কথাটা ঠিক…কিন্তু আপনার সঙ্গে জীবনে আর যে দেখা হবে না, সেটা তো প্রসপেক্ট নয়।

কি অদ্ভুত কথা! টিচার মানসী যেন পনর মিনিটের একটা অদৃষ্টের ম্যাজিকের জালে পড়ে নেভির কনিষ্ঠ অফিসার এই অজয়ের জীবনের সব কামনার প্রেয়সী হয়ে উঠেছে, যার জন্যে বড় অফিসার হবার প্রসপেক্টও শূন্য করে দিতে চায় অজয়।

মানসী বলে, আর বলতে গিয়ে চোখ দুটোও সত্যিই ঝাপসা হয়ে যায়—দেখা হবে না কেন? ফিরে এলেই দেখা পাবেন।

অজয়—আসি তাহলে?

মানসী—আসুন।

ঘড়ির কাঁটা বলছে, সাতটা বাজতে দু'মিনিট বাকি।

পোড়া সিগারেটের ছোট টুকরোটাকে ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় অ্যান্টি-সাবমেরিনের অজয়।

ভক্তি মাসিমা ডাক দেন—চল মানসী।

মানসী যেন ভক্তি মাসিমার এই চেঁচিয়ে বলা কথাটাও শুনতে পায়নি। অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মানসীর কালো চোখের তারা দুটো যেন ছটফট করে একটা অভিযোগ জানাতে চাইছে। হঠাৎ বলে ওঠে মানসী—তাই বলে ওভাবে সারাজীবন বাইরে বাইরে পড়ে থাকাও উচিত নয়।

অজয় হাসে—সারাজীবন কিন্তু মাইনেটা ভাল পাওয়া যায়। প্রসপেক্ট আছে।

—প্রসপেক্ট না ছাই। হঠাৎ ভ্রূকুটি করে কেমন-যেন রুষ্ট স্বরে কথাটা বলে ফেলেছে মানসী। অজয়ও আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

বোধ হয়, নিজেরই এই হঠাৎ-মুখরতার রকম দেখে একটু লজ্জিত হয়ে মানসী বলে—আপনার আপনজন কেউ নেই বলেই কি আপনি নিজের উপর নিষ্ঠুর হবেন?

অজয়—কি বললেন?

মানসী—কাজ শিখে দেশে ফিরে আসুন।

অজয়—আপনি…সত্যিই কি আপনি আমাকে অনুরোধ করছেন?

মানসী—হ্যাঁ।

দোপাটির ছোট একটা গুচ্ছ, জরি দিয়ে জড়ানো। মানসীর হাতটা কখন ভুল ক'রে দোপাটির সেই গুচ্ছটাকে পাশের কোচের উপর রেখে দিয়েছে, সেটা বোধ হয় বুঝতে পারেনি মানসী। কিন্তু এইবার বুঝতে হয়, কারণ দেখতে পেয়েছে মানসী; অজয় যেন পিপাসিতের মত জরি-জড়ানো দোপাটির ছোট গুচ্ছটার দিকে তাকিয়ে আছে।

চলে গিয়েছে অজয়। রেস্টরুমের ভিড় বেশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

চমকে ওঠে মানসী, পাশের কোচের উপর জরি-জড়ানো দোপাটির গুচ্ছটা নেই।

—কি খুঁজছো মানসী? প্রশ্ন করেন ভক্তি মাসিমা।

—ফুলের তোড়াটা গেল কোথায়?

—নিয়ে গেছে।

—কে? কে নিয়ে গেছে?

—নাম জানি না।

—অজয়?

—তাই হবে।

হ্যাঁ, দেখতে পায় মানসী. প্লেনে সীট নেবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে নীতীশ। প্রশস্তির আর সম্বর্ধনার আর প্রীতির সেই উৎসবটা নীতীশের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। মানসীর দিকে তাকিয়ে হাতটা একবার দুলিয়ে বিদায়ের সঙ্কেত জানিয়েছে নীতীশ।

শুধু কয়েকটি মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী। তারপরেই রেস্টরুম থেকে বের হয়ে, করিডর পার হয়েও এগিয়ে যায়। রেলিংয়ের গায়ের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যত বিদায়-ঘটার আনন্দ আর উদ্বেগ তখন রুমাল উড়োতে শুরু করেছে। অনুভাদি আছেন, মৃদুলাও আছে।

মানসীকে দেখতে পেয়ে অনুভাদি আর মৃদুলার মুখের সেই ঠাট্টার হাসি আবার কুঁচকে ওঠে। কিন্তু তার পরেই যেন হঠাৎ বিস্ময়ে চমকে ওঠে অনুভাদি আর মৃদুলার ঠাট্টার চোখ।

ও কি? কার চোখের আশাকে আশ্বাস দিয়ে সুখী করবার জন্য রুমাল দোলাচ্ছে মানসী?

প্লেনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অপরিচিত যে ভদ্রলোক হাত তুলে

বিদায়ের সংকেত জানিয়েছেন, তাঁরই উদ্দেশ্যে রুমাল দুলিয়ে যেন সান্ত্বনার অর্ঘ্য ছুঁড়ে দিয়েছে মানসী।

অনুভাদি বলেন—ভুল করলেন।

মানসী—না।

মৃদুলা বলে—উনি কিন্তু আমাদের মেজদা নন। আপনি চিনতে ভুল করেছেন।

মানসী বলে—জানি। চিনতে একটুও ভুল করিনি।